স্বর ছন্দে

বিমল সেন

স্ব

দু'জ

বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

প্রকাশক
ব্রজবিহারী বর্ম্মণ
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

পাঁচসিকা

প্রিণ্টার—
শ্রীপুলিন বিহারী সামন্ত
শ্রীদুর্গা প্রেস
১১, গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

সূচীপত্র

গল্পের ছলে ৭

রাজা ১৩

কয়েদী ২০

দেশ স্বাধীন হ'লে ২৮

তিনচালে কিস্তি মাৎ ৪৫

সর্বজনীন ৫২

ক্লীব ৬৪

স্বর্গাদপি ৬৭

দু'জন খুনী আসামী ৮৪

রক্ষক ৯০

মানবের নাহি দেয় দোষ ৯৪

—০—

নীহারিকা দেবী

মানুষ তার প্রিয়াকে সাজায়
যত কিছু আভরণে, তা থেকে
তোমায় আমি মুক্ত করেছি
যে মন্ত্র কানে দেবার জন্য,
গল্পের ছলে তারই ইঙ্গিত
দিলুম।

গল্পের ছলে

মাসিমার বাড়ি সেদিন পিঠে খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল। যাচ্ছি—পথে দেখা রাইচরণ সরকারের সঙ্গে। অনেক-দিন পরে দেখা ; কাজেই নানা কথা পাড়তে পাড়তে এগিয়ে চ'ল্‌লুম্‌। রাইচরণও চট্‌পট্‌ জবাব দিতে লাগলো। শেষটা জিজ্ঞেস্‌ ক'রলুম, আচ্ছা রাইচরণ, তুমি কি এখনও গোবিন্দ-বাবুর ওখানে চাকুরি কর ?

আজ্ঞে না।

তা'হলে ?

চাকুরি করার তো আর দরকার নেই।

কেন বলোতো ?

আজ্ঞে, আমিই একরকম কর্তা এখন।

বলো কি ? গোবিন্দ বাবুর দু' পরিবারের কেউ বুঝি জীবিত নেই ?

রাধে গোবিন্দ !—জীবিত তারা উভয়েই আছেন।

তবে ? তাঁরা বর্তমানে তুমি কি ক'রে কর্তা হ'লে ?

আজ্ঞে, বিধির বিধান, গোবিন্দের ইচ্ছে, রাধামাধবের করুণা।

তোমার ওসব বুজ্‌রুকি রাখো, রাইচরণ। রাধা-মাধবের ইচ্ছেয় যে তুমি এ মুল্লুকে আসোনি, তা আমি বেশ জানি। সাঁচা কথাটা কি বলে ফেলো দেখি।

আজ্ঞে, এইতো সাঁচা কথা। গোবিন্দবাবুর বড় অসময় দেখে রাধামাধবের দয়া হ'ল—এ অধমের ওপর আদেশ হ'ল, যাও, গোবিন্দবাবুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করগে।

এ পর্যন্ত তোফা শুনায় রাইচরণ, এ আমিও কবুল কচ্ছি। কিন্তু তার পরেরটা ব'লে যাও—বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে কেমন চাল চেলে যথাসর্বস্ব নিজে নিলে মালিকদের ঠকিয়ে—ব'লে যাও। বলে যাও।... কিহে হাসছ যে! ওঃ,—তা'হলে এখনও তোমার বিপদ-উদ্ধার ব্রত শেষ হয়নি? আরো দাঁও মারবার মতলবে আছো?

রাইচরণ হেসে ফেল্‌লে—আপনার সঙ্গে পেরে উঠি নে দা'ঠাকুর। শুনুন্ তা হ'লে।

স্থাবর অবস্থায় বহুৎ সম্পত্তি রেখে গোবিন্দবাবু তো চক্ষু বুজলেন। পিছনে রইলেন ছোট গিন্নি আর

বড় গিন্নি। উইল নেই—কাজেই তুমুল মামলা বেধে গেলো।

আমি দেখলুম্ এই সুযোগ। এই দু'য়ের ঝগড়ার আগুন জীবিয়ে রাখতে পারলেই কিস্তিমাৎ। দিনে বড়র মহলে গেলুম, বুঝিয়ে বল্লুম্,—সুয়োর হাতে মা, খবর্দার একটি কানা কড়িও যেতে দিওনা! এতদিন ওরই রাজত্ব ছিল। কতটা নাকাল হয়েছো, তা বোধ হয় এখনও ভোলোনি।

বড় গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন, ভুল্‌বো, সাত জন্মেও ভুলবোনা!

হাঁ, এইতো চাই। তা হ'লে মা, একজনের সাহায্য চাই—শত হ'লেও মেয়ে মানুষ তুমি।

হাঁ, তা ঠিক ব'লেছ। তা তুমিই তো আছো রাই-চরণ। আমি বরং লিখে দিচ্ছি সব তোমার নামে।

বাস্, কেল্লা ফতে।

এই ব'লেই রাইচরণ হো হো ক'রে হেসে পড়লো।

আমি বল্লুম দাঁড়াও, কেল্লা এখনও ফতে হয়নি। ওপক্ষকে কি করে বশে আন্‌লে?

রাইচরণ ব'ললে, আজ্ঞে ছোট গিন্নির কথা বলছেন? তিনি তো আমায় দেখেই লুপে নিলেন!

নিলেন ?

হাঁ, জানেনইতো, চিরকালই তিনি আদুরে। আমি বল্লুম, সর্বনাশ মা, এইবার রাজত্ব যায়! ও বড়। আইনত ওই এখন মালিক। একমুঠো ভাতের জন্য তোমায় ওর দাসীপনা করতে হবে।

ছোট গিন্নি বোমার মত ফেটে পড়লেন, দাসীপনা ওই আমার ক'রে এসেছে এতদিন, এখনও ওই করবে। সম্পত্তির এক কানাকড়িও না পায়, তাই কর রাইচরণ।

আমি বল্লুম, আজ্ঞে রাণীমা, আমার যতদূর শক্তি, তাতে কি আর কসুর ক'রবো!

ছোট গিন্নি বললেন, শক্তি আমি তোমায় দেবো, ষোল আনা লিখে প'ড়েই দিচ্ছি।

বাস! কিস্তিমাৎ!

আবার হাসি রাইচরণের।

আমি বললুম, দাঁড়াও, এখনও একটু খট্‌কা থেকে গেলো। দু'শরিকের সঙ্গেই তুমি কি ক'রে এমনভাবে মিশ্‌তে ?

রাইচরণ বললে, আজ্ঞে, ছোটগিন্নির কাছে যেতুম রাত্রে —অন্ধকারে ব'সে কথা হ'ত সব। বড়র কাছে যেতুম দিনে।

আচ্ছা, এমনি ক'রে সম্পত্তিতো পেলে, তারপর ?

তারপর সম্পত্তি আর ছাড়লুম না!

সে কি? ওরা তোমার চালাকি ধরতে পারলোনা?

আজ্ঞে পারলো বৈকি! বড়গিন্নি তা বুঝলেন, দাবি করলেন। আমাদের সম্পত্তি নিয়ে আমরা দু' বোনে বুঝাপড়া করবো, তুমি চলে যাও। আমি গেলুম না।

তাতো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কি ব'ললে?

ব'ললুম কি ক'রে যাই, বড়মা। গেলে এক্ষুণি যে দুই শরিকে রক্তারক্তি শুরু হবে।

ছোটগিন্নি কি বললেন?

বললেন, খবর্দার তুমি যেয়োনা রাইচরণ—তুমি গেলেই ওই আবাগীর রাজত্ব হবে। তোমার হাতেই কর্তৃত্ব থাক্, ওর চেয়ে বেশিবেশি করে মাসহারা দিলেই আমি খুশি থাকবো।

এই বললেন?

হাঁ! আমিও তাই আছি দিব্যি আরামে। দু' গিন্নিকে যা'হক কিছু দিই—বাকি সব, বুঝতেইতো পাচ্ছেন।

তাহলে বেশ মজা লুটছো তুমি?

আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের দয়ায়। তবে ইদানীং একটু ফ্যাসাদে পড়েছি। বড়গিন্নী কোমর বেঁধে লেগেছেন—তাড়াবেনই। ভরসা ছোট এখনও ভিড়ছেন না তাঁর দলে।

তাহলে আসি, নমস্কার।

রাইচরণ চলে গেলো।

আমি ভাবতে লাগলুম—সুয়ো দুয়োয় ঝগড়া বাঁধিয়ে ওর রাজত্ব—সুয়ো দুয়োর মিলন হলেই ওর অবসান।

দুয়োর ভুল ভেঙেছে।

সুয়োর ভুল ভাঙবে কবে?

রাজা

২১শে ভাদ্র, ১৩০৯

বাবা,

মন দিয়ে লেখাপড়া করিস্। তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শুনবি, আমি কাল রাত্রে তোর ওপর কি স্বপ্নে দেখেছি? দেখলুম যেন আমি বুড়ি হয়ে গেছি, চুল আমার পেকে চূণের মত সাঁদা হয়েছে। কিন্তু কি আনন্দ! তুই আমার রাজা হয়েছিস।

হাসিসনে বাবা! সত্যিই তাই। দেখলুম, তুই যেন সবার—সবার উঁচু আসনে উঠে বসেছিস। তোর নীচে দাঁড়িয়ে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, সঙীনধারী কত গোরা। আর সে রাজবাটীটা বা কত বড়! সেপাই-শান্ত্রীতে গমগম্ করছে। পাহারাদাররা পহরে পহরে ঘণ্টা বাজায়! এসব সত্যি বাবা!

আমি কিন্তু প্রথমটা কিছুই ঠিক পাইনি। শেষে গুরুঠাকুরকে আনালুম। তিনি এসে আমার স্বপ্নের খুঁটিনাটি প্রথমটা শুনলেন, তারপর তোর কোষ্ঠী দেখে বললেন,

শচীপতির মা, তোমার ছেলের রাজলক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। ছেলে তোমার রাজা হবে।

বাবা, ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন এতদিনে। তাঁর ওপর ভক্তি রাখিস। রোজ তাঁকে ডাকবি। শুধু রোজ নয়, সব সময়। ডাকবি আর বলবি, ঠাকুর, আমায় রাজা হবার উপযুক্ত করো।

আমার স্বপ্ন মিথ্যা হবে না—কখনও হয়নি! আমি আজই হরির লুট দিচ্ছি।

পত্র পাঠ উত্তর দিস।

হ্যাঁ, ছাখ, কালীঘাটে গিয়ে পাঁচসিকার ভোগ দিতে ভুলবিনে। এ গুরুঠাকুরের বিধান……না, না,—তোর মায়ের আদেশ।

—মা।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

মা,

আমি রাজা হয়েছি! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। তোমার স্বপ্ন সত্য না হয়ে পারে? গুরুঠাকুরের গণনা ভুল হতে পারে?

আমি রাজা হয়েছি। আমি সবার উঁচু আসনে,

আমার সিংহাসন তলায় দাঁড়িয়ে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-পুলিশ-গোরা, আমার দেহরক্ষী চারদিকে।

তুমি ঠিক স্বপ্ন দেখেছিলে মা!

মা, সেই তোমার 'রাজা-হওয়ার' চিঠি পেয়ে আমি কালীবাড়ি মানৎ দিতে গিয়েছিলুম। পথে দেখি, একটা শোভাযাত্রার উপর লাঠি চলছে বেদম্। একটি বুড়ি, সে তোমারই মতো দেখতে, মা। তাঁর কপালে এসে এক ঘা পড়তেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। আমি রাজা হবো, আমি ভাবি, রাজা আমি—এ সইব কেন মা?

বুড়ির কাছে গিয়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলুম। বুড়ির কপালের রক্ত এসে আমার গায়ে লাগতে লাগলো। কপালেও লাগলো এক ফোঁটা।

মনে মনে হাসলুম আমি, মা। তোমার স্বপ্ন যে ফলতে শুরু হয়েছে,—নইলে এ রক্তের রাজটীকা পড়লে কেন, মা, আমার কপালে? রাজটীকা পরলুম!

তারপর দীর্ঘবছর বসে রইলুম প্রতীক্ষায়, কোন্ রাজা-হীন রাজ্যের হাতী এসে আমায় মাথায় তুলে নিয়ে যাবে।

কিন্তু, মা, এ যুগে তো হাতী আসার দরকার হয়না! একদল লোক আছে মা, যাদের কাজই হল রাজা খুঁজে

বেড়ানো। তারা দেখলে, আমার রাজার মত মেজাজ। তাই তাদের নজর পড়লো আমার ওপর। এমন ভালো-বাসতো তারা আমায়, তা তোমায় কি বলবো মা! সজাগ থাকি, তখনও তারা পাহারা দিচ্ছে! ঘুমিয়ে থাকি, তখনও তাদের আলস্য নেই। আমি হাঁট্লে হাঁটে, ছুটলে ছোটে, বসলে বসে—অবশ্য সসম্ভ্রমে, দূরে, একান্তে,···এমনি ভক্তি।

শেষে এই ১লা বৈশাখ শুভদিনে, শুভক্ষণ দেখে, তারা এসে আমায় আহ্বান করে নিয়ে গেলো। যেখানে গেলুম, মা, সে সত্যই প্রকাণ্ড এক রাজপুরী, চারদিকে দুর্গের দেয়াল কি উঁচু! আর বন্দোবস্তই বা কি সুন্দর! শত্রুর আক্রমণের কোনো আশঙ্কা নেই। ভিতরে সুন্দর সুন্দর বাগান, কোঠাবাড়ি, সিপাই-শান্ত্রীর চমৎকার বন্দোবস্ত! দু'হাজার লোকে রোজ খায়। পাঁচটার মধ্যেই খাওয়া শেষ। আমি খেয়ে-দেয়ে-শুয়ে গুন্‌গুন্ করে গাইছি, আর ভাবছি, রাজটীকা হল, রাজবাড়ি হল, আর এক ধাপ বাকি—বাকি রাজসিংহাসন। সে ক্ষোভও আমার হিতৈষীরা থাকতে দেবেন কেন? মন্ত্রী-সভায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বিচার হল আমি রাজা হওয়ার উপযুক্ত কিনা।

আমি ত্বু'চারটে কথা বলতে লাগলুম, হিতৈষীরা ডেকে বললেন, তোমার কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তা, বটে ? ওরাতো এতদিন থেকে আমার রাজলক্ষণ দেখে আসছে। তবে একটা কথা তাদের আমি বুঝতে পারলুম না, মা। ওরা বলছে, আমি নাকি খুন করেছি —যাক্, সে সব কথা শুনে তুমি আর কি করবে মা ? তোমার ছেলের রাজা হওয়ার কাহিনী শোনো।

হিতৈষীরা প্রসন্ন হলেন। ঠিক হল ৩রা জ্যৈষ্ঠ আমি সিংহাসনে আরোহণ করবো।

আজ সেই ৩রা জ্যৈষ্ঠ। ভোরের সূর্য মাথার ওপর ওঠবার আগেই আমি রাজা হব। তোমার স্বপ্ন কি মিথ্যা হতে পারে, মা !

আমি দশ পাউণ্ড ওজনে বেড়ে গেছি, মা, রাজা হওয়ার আনন্দে। পোড়া ঘুমও বেড়ে গেছে চোখে !

যাক্ এর পরে তো ঘুমুবোই মা। দীর্ঘ ঘুম, অব্যাহত ঘুম ! রাজার ঘুম !

আজ কোনো মতে চোখ মেলে সিংহাসনে উঠতে হবেই যখন, তখন দেরি করে লাভ কি !

তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে নিলুম। গান গাইতে গেলুম, গাইলুমও প্রাণ খুলে। সবাই আশ্চর্য হল। বোধ হয়

আমার তালভঙ্গ দেখে, সুরও বোধ হয় এদের পছন্দ হল না।

না হ'ক। তাতে আমার আনন্দের কমতি হল না।

তারপর রাজসিংহাসনে এই এসে উঠে দাঁড়িয়েছি। মা, আমার সামনে তুনিয়াটা আজ হাসছে কেন অমন করে! আর বন্ধুদের চোখেই-বা জল কেন!

বন্ধুদের বোধ হয় হিংসে হচ্ছে আমি রাজা হচ্ছি ব'লে!

মা, তোমার গুরুঠাকুরের গণনাঠিক ফলেছে। এই ত আমার নীচুতে সবাই দাঁড়িয়ে—জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, গোরা। আমার নীচুতে ওরা।

আমায় জিজ্ঞেস কচ্ছে, কি সাধ আছে তোমার?

আমি হেসে বললুম, আমি শচীপতি, আমার শচীকে এনে দিতে পারো?

ওরা হাসলো একটু! মা, সকাল বেলার রোদকে কখনো শ্মশানের কালি-মাখা চিতার ওপর পড়ে কান্না-ভরা হাসি হাসতে দেখেছো? এ সেই হাসি! উঃ, হাসি যে অত মলিন হতে পারে, তা আমি কল্পনা করতে পারিনি।

আমি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললুম, মাকে যখন আপনারা আসতেই দিলেন না, তখন তাঁকে আমিই খবর দিতে চাই।

ওরা আমায় লেখার সরঞ্জাম এনে দিলে।

আমি এই সিংহাসনের উচ্চ মঞ্চ থেকে তোমায় লিখে জানাচ্ছি, মা, তোমার প্রতি ভগবান সদয় হয়েছেন, তোমার স্বপ্ন ফলেছে, গণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে, মা! তোমার ছেলে রাজা হয়েছে······

—শচীপতি

কয়েদী

আমি একজন কয়েদী।

আমাকে আপনারা সবাই চেনেন। আমাকে কয়েদ করে রাখার ব্যবস্থাও আপনারাই করেছেন। কাজেই আপনাদের কাছে ছাড়া আর কার কাছে আমার দুঃখের, আমার অপমানের কাহিনী বল্‌ব ?

আমি তরুণ, এই বোধ হয় আমার অপরাধ। তাই দশটা থেকে পাঁচটা আমার কয়েদ।

যে জেলখানায় আমি বন্দী থাকি, তা নেহাৎ ছোট নয়, বেশ বড় পাকা বাড়ি—প্রায় দেড়হাজার বন্দী সেখানে ধরানো হয়। এক-একটা কামরায় পঞ্চাশটা করে কয়েদী। সবাই আমার মতো তরুণ, আমার চেয়ে ছোটও অনেক আছে। সবারই আমার মতো অদৃষ্ট, সবাই কয়েদী।

এতবড় জেল, কাজেই বুঝতে পার্চ্ছেন একজন রক্ষকে কুলোয় না। সর্দার জেলারের সঙ্গে জন তিরিশ সাকরেদ জেলার যোগ দিয়ে আমাদের রীতিমত শাসন করেন।

শাসন হয় অবশ্য বেত্রদণ্ড দিয়ে। মুষ্টিযোগ, চপেটা-ঘাত এবং কর্ণমর্দন সর্বদাই ব্যবহৃত হয় ফাউ হিসাবে। দু'একজন লোক আবার একধাপ উপরেও ওঠেন—তারা আমাদের ওপর কটু রসযুক্ত উপহাস-বাণ নিক্ষেপ করে রসিকতা করেন। মোট কথা, আর কিছু হক্ না হক্, শাসনের ক্রটি হয়না কোনো রকমে, কোনো দিক দিয়ে।

আমারই এক সঙ্গী আপশোষ করে বলেছিল, এর চাইতে একটা ঘানি এনে রাখলে পারে—এসব দণ্ড না দিয়ে দণ্ড দেবে—ঘানি টানো। শাস্তিও হবে, তেলও হবে : কিন্তু এসব মতলব জেলারদের দিতে যাবে কার এত সাহস! কাজেই মনের কথা মনেই চেপে রেখেছি এতদিন। আজ আপনাদের কাছে করযোড়ে নিবেদন করলুম। আপনারা কর্তা, দেখুন না চেষ্টা করে জেলগুলিতে দু'চারটা করে ঘানি বসাবার বন্দোবস্ত করতে পারেন কিনা? আমরা খুশিসে ঘানি টানব; কিন্তু জেলাদের এই মিছরীর ছুরির মত শাস্তি সহ্য হয় না।

প্রেসিডেন্সি জেলে দেখেছি কয়েদীরা ঘুরে ফিরে কাজ করে বেড়ায়—বেশ আছে তারা—আলোর সাথে, হাওয়ার সাথে অবিরাম পরিচয় হয় তাদের। আমাদের এ জেল আজব জেল। আমাদের নড়ার যো নেই—যেমন আছি

ঠিক তেমনি থাকতে হবে। ঘরের ভিতরে আমরা বন্দী। বাইরের আলোর দিকে চেয়েছি কি শাস্তি, কারু সঙ্গে কথা বলেছি কি দণ্ড। উঠতে শাস্তি, বসতে শাস্তি। অন্যায় করলে শাস্তি। অন্যায় করেছি, এ সন্দেহ হলে শাস্তি। অন্যায় করিনি, একথা বোঝাতে গেলে শাস্তি। জেলারদের কোনো অশোভন কাজের প্রতিবাদ করতে গেলে শাস্তি।

জেলারদের কাছে ভালো কে ? যে লক্ষ্মী হয়ে বসে চুপ ক'রে বিনা প্রতিবাদে তাদের কথা শোনে, তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তাদের বক্তব্য না বুঝলেও মাথা নেড়ে বলে, হাঁ, বুঝেছি। যে সেলাম ঠুকে ভক্তি দেখায়, অন্যায়েরও প্রতিবাদ করেনা, সাতচড় খেয়েও মুখ খোলেনা সে-ই ভালো কয়েদী।

কিন্তু সত্য কথা বলতে কি মশাই, এ এমন আজব কয়েদখানা যে এখানে যে-কোনো কয়েদীই আসুক, সে যত খারাপই হক না কেন, তাকে এমনি ভালো হতেই হবে, না হয়ে উপায় নেই। এমনি ব্যবস্থা, এমনি বিচার, এমনি দণ্ডনীতি। মিণ্টে দেখেছি একটা ম্যাসিন থেকে টাকা তৈরি হয়ে বেরুচ্ছে—কি আশ্চর্য মশাই, একটা টাকায় আর একটা টাকায় একচুল তফাৎ নেই, একেবারে হচ্ছে এক। আপনার বোধ হয় এ দেখা হয়নি, কারণ মিণ্টে হয়তো আপনি

ঢুকতেই পারেননি। কিন্তু আপশোষ করবেন না—আমাদের দেশে আপনাদের পাড়ায় পাড়ায়ই আছে—ইচ্ছে করলেই ঢুকে দেখতে পারেন। এও একটা ম্যাসিন—এখানে যে-সব কয়েদী পড়ে, তারাও একছাঁচে ঢালাই হয়। ছবি সহ বিশেষত্ব নষ্ট করে একাকার করে দেওয়াই হচ্ছে এ জেলখানা-ম্যাসিনের বিশেষত্ব। আর এ ম্যাসিনের ছাপ সব কয়েদীর গায়েই দেওয়া হয়, আমরা সব কয়েদীমার্কা। কোনো বেয়ারা কয়েদীর গায়ে যদি এ ছাপ না পড়ে বা ঠিক মতো না পড়ে, যদি তার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু দেখা যায়, তবে আর কি, সে অচল। মিণ্টের ছাপ-হীন বা বিকৃত-ছাপ টাকার মতো অচল।

কিন্তু একটা মজা কি জানেন, অচল টাকাগুলো যেমন বাইরে গিয়ে গয়না হয়ে শোভা পায়, এই বেয়ারা কয়েদী-গুলোও তেমনি নাম করে ফেলে ত্বনিয়ায়।

আর সাধে কি কয়েদী বিগড়ায়? মশাই, পাশুপতবাণ সহ্য হয়, কিন্তু উপদেশ-বাণ সহ্য হয়না।

কি করব, আগেই এ জেলখানাটাকে মিণ্টের সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছি, নইলে একে ব্যাপটিস্ট মিশনের সঙ্গে তুলনা করতুম। বুঝলেন মশাই—এটা হচ্ছে একটা মস্ত বড় নীতিমালা। যেসব লোকের আর কোথাও ভাত জোটেনা,

যাদের বিনিয়ে কথা বলা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা নেই, যারা দৈহিক শাস্তি ছাড়া শাসনের আর কোনো পদ্ধতি জানেনা, তারা এখানে নীতিবাক্য বেচে নাম এবং অর্থসংগ্রহ দুইই করতে আসে, খালি নীতি, আর নীতি। কান ঝালা-পালা, মন ঝালাপালা, জেলখানা ঝালাপালা, যেন নীতি প্রচার করেই জেলার মশাইরা বিশ্ব উদ্ধার করবেন। কে ওদের বুঝিয়ে দেবে, বাল্যশিক্ষা এবং কথামালার দৌলতে আমরা যে নীতি শিখেছি, তাতে ওদেরই আমরা বহুৎ শিখিয়ে দিতে পারি।

হাসবেন না, আমি ঠাট্টা করে বলিনি, নীতি শেখবার দরকার আমাদের চাইতে ওদের একচুল কম নয়। ওরা নীতি আমাদেরই শিক্ষা দেয়, নিজেরা মানে না। আমাদের বলে, সত্য বল; ওরা নিজেরা বলে দরকার মতো মিথ্যা কথা। আমাদের বলে, চুরি করোনা; ওরা চুরি ক'রে করে উপরি আয়। আমাদের বলে, সাহসী হও; ওরা জুজুর ভয়ে কাঁপে। সর্দার জেলার তার চেলাদের নিয়ে বড়কর্তার খোসামুদি করছেন বলেই তো এখনো ওরা টিকে আছে। আমরা কয়েদী ওদের, ওরা কয়েদী বড় কর্তার। কাজেই ওদের কাছে আমরা কি নীতি শিখব?

বড়কর্তার কোন এক গুরু ছিলেন—বাঙাল দেশে

বাড়ি। সে গুরুদেব হয়তো ভালোই ছিলেন, কিন্তু এই যদি হয় তার চেলার দল, তবে আর তাকে তারিফ করতে পারি-না। এরা বলেন, গুরুদেবের নির্দিষ্ট পথে চলেছি আমরা! মুখেই বলেন, কাজে চলেছে নিজেদের ইচ্ছামত পথে, নিজে-দের ইচ্ছামত মতে। শয়তানও যেমন দরকার মত বাই-বেলের অংশবিশেষ ছেঁটে-কেটে কোট করে, এরাও তেমনি নিজেরা কি করবেন, তা নিজেরাই ঠিক করে তারপর গুরু-দেবকে দিয়ে সেই মতলব সমর্থন করান। এতে করে আমা-দের উন্নতি এরা বিন্দুমাত্র করতে না পারলেও গুরুদেবের দফা এরা সেরে দিয়েছেন! দরকারে-অ-দরকারে, ঘরে-বাইরে, ঘাটে-পথে, খেতে বসে, আঁচাতে গিয়ে, ছোট কথায় বড় কথায়, গুরুদেব এই বলেছেন, গুরুদেব ঐ বলেছেন বলে গুরুদেবের নামটাই তেতো করে দিয়েছেন আমাদের কাছে। নেবুকে অত্যধিক টিপলে যেমন ভালো রস আর বেরোয়না, তেতো রসই বেরোয়, তেমনি আর কি।

সব জেলখানাতেই মশাই, এই ফ্যাসাদটা লেগেই আছে। নীতি সব জেলেই দেদার ছড়ানো হয়, আর একজন গুরুর দোহাইও প্রায় জেলেই আছে।

দৈহিক শাস্তির চাইতে এই মানসিক শাস্তিটাই আমা-দের কয়েদীজীবনকে অসহ্য করে তুলেছে বেশি।

আমরা মানুষ হচ্ছিনা—হচ্ছি একদল ভণ্ড। জেলার-দের সামনে হই ভক্তি গদগদ, তাদের চোখের আড়ালে করি তাদের আছশ্রাদ্ধ। ওরা মনে করেন, 'আমরা যে যাই হইনা কেন, ওদের তো নীতিসম্পন্ন করে তুললুম।' আর আমরা মনে মনে বলি, 'আমাদের উপদেশ দেবার আগে তোমরা নিজেদের চরকায় তেল দিয়ে নাওতো বাপু। নইলে লক্ষ্মীর মতো তোমাদের উপদেশ কানে শুনে যাব, কাজে করবনা।' আর করিও না, কিন্তু ওরা নাছোরবান্দা, উপদেশ দেবেই। যেন উপদেশ দেওয়াই ওদের ব্যবসা, যেন আমাদের ভালো করার ব্রহ্মাস্ত্র ঐ উপদেশবাণ।

মশাই, ওদের দয়া করে বলে দিতে পারেন না, বুঝিয়ে দিতে পারেন না, উপদেশ আমরা চাই না। আমরা চাই আদর্শ। আমরা আদর্শের অনুকরণ করি, উপদেশের নয়। বড়কর্তা উপদেশ দেন, জাতিভেদ মেনোনা, অথচ তার বাড়ি দেখি আজো বামুনে রাঁধছে, নমঃশূদ্রে নয়। সর্দার জেলার উপদেশ দেন যে Punctual হও, অথচ তিনি একটি Late Lateef—জেলখানার তত্ত্বাবধানের কাজ ফেলে রেখে বাজার করতে ছোটেন তিনি। মেজকর্তা বছর-ভোর বেত মারেন আর কাঁদেন, কাঁদেন আর বেত মারেন। মশাই, আমরা সব দেখি, সব বুঝি,—এ চালাকির কর্ম নয়, ওরা ধরা পড়ে

গেছেন—সব জেলার একজোট হয়ে ভাবেন, কি হবে—ওদের শাসন কি ক'রে চলবে, কারণ বেত ওদের হাতে। বড়কর্তার Vanity চলবে : কারণ বেতন তার হাতে, কিন্তু নীতি আর চলবে না। উপদেশ—বুদ্বুদ, বাক্য-স্রোতের উপরই ভেসে বেড়াবে, আমাদের গায়ে আর ঠেকানো চলবেনা।

এ আমরা চাই না।

আমরা চাই বাড়তে নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। জেলাররা যদি বৈশিষ্ট্য বলে কোনো জিনিসকে স্বীকারই না করেন, বৈশিষ্ট্যকে যদি তারা মনে করেন উচ্ছৃঙ্খলতা, নিয়মলঙ্ঘন, অবাধ্যতা—তবে তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতার জন্য তারাই ফেল পড়বেন, আমরা চাপা পড়বনা।

আমরা তরুণ।

আমাদের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। খাতা-পেন্সিল, বই-শ্লেট, বেঞ্চি, টেবিল, ব্লাক-বোর্ড দিয়ে, উপদেশ দিয়ে আমাদের ভোলানোর চেষ্টা বৃথা!

আমরা মুক্ত হবই।

এ সবই থাকবে—থাকবেনা শুধু আমাদের বন্দীত্ব—থাকবেনা শুধু উপদেশ-সর্বস্ব দণ্ডধারী ব্যবসায়ী জেলারদল—থাকবেনা শুধু বড়কর্তার এই অহেতুক ছড়ি ঘোরানো!

জনৈক স্কুলের ছাত্র।

দেশ স্বাধীন হ'লে

বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমি একবার রিপ্ ভ্যান্ উইংকেলের মতো লম্বা এক ঘুম দিয়ে ছিলুম।

তাও আবার যেখানে সেখানে নয়, একেবারে হাওড়া স্টেশনের এক পড়ো বাড়ির অন্ধকার এক কামরায়।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এক জাঁদরেল চেহারার লোক—দরোয়ানই হবে—আমায় ঠ্যালা দিয়ে তুলে দিলে। আমি উঠতে জিজ্ঞেস করলে, এখানে কি মনে করে?

কি সন্দেহ সে করেছে বুঝতে পেরে আমি মিনতির সুরে বললুম, দোহাই বাবা, আমি চোর, ডাকাত কি টেররিস্ট নই, আমি তারকেশ্বরে যাব।

কেন?

বাবা তারকেশ্বরের পায়ে হত্যা দিতে।

দরোয়ান মশাই যদি আবার প্রশ্ন করতেন, কেন, তাহলেই গেছলুম আর কি! মিথ্যা না বলে উপায় ছিল না। আমি যাচ্ছিলুম, বাবার কাছে হত্যা দিতে, ভারতবর্ষ

স্বাধীন হ'ক এই পণ ক'রে—গান্ধীজি যেমন উপবাস করেছেন অনুন্নত সম্প্রদায়ের মীমাংসার পণ নিয়ে। আমার কিন্তু গান্ধীজির এ উপবাস নিয়ে বরাবরই একটা খটকা রয়ে গেছে। উপবাসের যখন এমন নিদারুণ (দারুণেরও এক-ডিগ্রী উপরে) শক্তি, তখন তিনি ঐটুকু পণ করেই থামলেন কেন ? পণ করলেই পারতেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলে আমি কিছু না খেয়ে, অথবা নুন্-জল খেয়ে প্রাণত্যাগ করবো —স্বাধীনতাটা আমরা গান্ধীজির জোরেই পেয়ে যেতুম। কিন্তু এ মনের কথাটা বলার সাহস ছিলনা গান্ধীজির অহিংস চেলাদের ভয়ে! অগত্যা, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার এ সহজ পথটা ঠাউরে নিয়ে আমিই চলেছিলাম তারকেশ্বরে।

কিন্তু দরোয়ানের কাছে আর একথা বলা যেতনা। তাতে এক ভয় ছিল, স্বাধীনতা কথাটা উচ্চারণ করার পাপে অর্ডিনান্সে হয়তো পড়তে হ'ত, এবং দ্বিতীয় ভয়, গান্ধীজির চেলারা আমার ওপর খাপ্পা হ'য়ে উঠতেন। স্পর্দ্ধা তোমার তুমি গান্ধীজির সমকক্ষ বলে নিজেকে মনে কর।

তা করিনা এবং করিনা বলেইতো স্রেফ নিজের শক্তির উপর নির্ভর না করে বাবাকে মধ্যস্থ করব বলে তারকেশ্বরে চলেছি।

কিন্তু দরোয়ানের বোধ হয় সন্দেহ গেলনা। সে

আমাকে ধরে নিয়ে চল্‌লো স্টেশনে।

কি আর করি। স্টেশনে ৫নং প্লেটফর্মে গিয়ে হাজির হলুম। একটি বাবু এসে বললে, দেখি তোমার টিকেট।

টিকিটখানা পকেট থেকে নিয়ে তার হাতে দিলুম।

বাবুটি টিকিটখানা হাতে নিয়েই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর আমায় কিছু বলবার ফুরসুৎ না দিয়ে একটা পুলিশ ডেকে আমায় ধরিয়ে দিলেন।

পুলিশও আমাকে ঠেলাগাড়ির মতো সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চললো। হাওড়ার দিকে নয়—ক'লকাতার দিকে।

মশাইরা, আপনারা বোধ করি কখনো অপরাধের দায়ে পুলিশের হাতে পড়েননি। তখন অবস্থাটা হয় কি রকম জানেন? লোকে আপনাদের পুলিশের হেপাজতে দেখে যতই আজব-চিজ দেখার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে থাকবে, ততই আপনারা এমনভাব করতে থাকবেন যেন পুলিশের সঙ্গে আপনাদের চলতে কোনোরকম অসুবিধাই হচ্ছেনা, এমন-কি আপনারা যেন খেয়ালই কর্চ্ছেন না সঙ্গে একজন পুলিশ চলেছে। আপনাদের দৃষ্টি দুইপাশে, ওপরে, নীচে, —যেন অসীম কৌতূহল এবং অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে আপনারা চোখের সামনে যে খুঁটি-নাটি জিনিসটি পড়ছে,

তাও দেখে যাচ্ছেন, কিছু আপনাদের চোখ এড়াচ্ছেনা, কিছু আপনাদের প্রশংসা এড়াচ্ছে না।

অন্তত আমার অবস্থা হয়েছিল তাই। কলকাতায় মশাই অনেক বেড়িয়েছি—অল্‌ডে টিকিট কেটে এবং হেঁটে, —কিন্তু সেদিন একঘণ্টায় হাওড়া স্টেশন থেকে লালবাজার থানা পর্যন্ত হেঁটে এতো সব জিনিস দেখলুম, যার একটা ফিরিস্তি দেবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পার্চ্ছিনে।

হাওড়ার পুলের উপর উঠে প্রথমেই চোখে পড়লো, পুলের মাঝখানে একটা বড় ন্যাশন্যাল ফ্লাগ বাতাসে উড়ছে। চারদিকে চেয়ে দেখলুম সার্জেণ্ট আছে কিনা —নেই। থাকলে এতক্ষণ ওটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। সঙ্গী পাহারাওয়ালা সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে গেলুম, কিন্তু মুখ খোলার উপক্রম করতেই এক ঠেলা। তাতে পা দুটোই দ্রুত এগিয়ে গেলো—প্রশ্নটা আর এগোতে সাহস পেলোনা।

একটা কথা খাঁটি বুঝলুম, প্রশ্ন এবং মীমাংসা—দুইই আমার নিজের করে নিতে হবে।

নীচোয় তাকিয়ে দেখি, সারিসারি নৌকা। মাঝিরা বসে তামাকু খাচ্ছে। একজন বলছে, দুত্তোরি মাঝিগিরি, তিনদিন ধরে এক পয়সা রোজগার নেই। এর চাইতে কুলি-গিরিও ভালো।

আমার প্রাণটা কেঁদে উঠলো। হায়রে, কবে স্বাধীন হবে দেশ, কবে ওদের দুঃখ ঘুচবে? মাঝিগিরির মেহনৎ আপনারা জানেন না নিশ্চয়ই। একটা কথা বললেই বুঝবেন, একবেলা নৌকা ঠেলে ওদের এতো ক্ষুধা হয় যে আপনার আমার মতো তিনচারজনের ভাত অতি সহজে খেয়ে তার চেয়েও সহজে ওরা হজম করে ফেলবে! অথচ এতো পরিশ্রম করেও ওরা অনেক সময় দু'আনা পয়সা মজুরি নিতে বাধ্য হয়। ঢাকায় আমি ছ'মাইল নৌকা বেয়ে দু'আনা নিতে দেখেছি মশাই।

কিন্তু ও লোকটি যে কুলির কথা বললে, তারা হ্যাঁ—এদের চাইতে সুখী? কিন্তু সুখীতো নয়! ঐতো মোট বয়ে চলেছে—ভালো করে চেয়ে দেখুন। মন থেকে সব সংস্কার ঝেড়ে ফেলে ওকে মানুষরূপে দেখুন, লক্ষ্য করুন, ওর পরনে কি? ওর ঘাড় কত বসে গেছে, কি নিদারুণ কষ্টের মধ্য দিয়ে ওর মুহূর্তগুলি কাটছে। কতদূর ও যাবে! তারপর কত ও পাবে? এক আনা, বড় জোড় দু'আনা। আচ্ছা, দিনে ও রোজগার করে কত? তাতে ওর পরিবার প্রতি-পালন হয়? হয় না। তাই ও খাটে, ওর বউ খাটে, ওর যুবতী মেয়ে খাটে, ওর কচি ছেলে খাটে। আপনাদের বউ-দের, কুমারীদের লজ্জা আছে, পর্দা আছে—ওরা একেবারে

লজ্জাজয়ী, বে-পরদা। আপনারা নিশ্চয়ই চান না, মেয়েরা জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়—কেমন, তাইতো? আচ্ছা, ওরা কেন তাহলে ঘরের বার হয়েছে? ওঃ বুঝেছি, ওরা আপনাদের চোখে মেয়েমানুষই নয়—ওরা কুলী। নয়? ওরা মোট বয়, রোজগার করে, মদ খায়, ধর্ম খোয়ায়, ব্যভিচার করে, রক্তারক্তি করে, তারপর অন্ধকার খোয়ারে গরু-ভেড়া-ছাগলের মতো ঠ্যাসা হয়ে জীবন কাটায়। আর রোগ হলে ......হাজারে হাজারে মরে। বিপদ হলে—লক্ষে লক্ষে মরে। কয়লার খনিতে আকস্মিক আগুনে মরে, লোহার কারখানায় গলিত লোহার ভিতর পড়ে মরে, গন্ধকের খনিতে বিষাচ্ছন্ন হয়ে মরে। দেখতে পান না, আপনাদের বিলাস-সামগ্রীতে ওদের রক্ত মাখানো! আপনারা শহরে বসে সুখভোগ করেন, ওরা গোপনে বসে তার জন্য বুকের রক্ত ঢালে। ওরা—ওই কুলীরা।

চোখ দু'টোকে জোর করে ফিরিয়ে নিলুম—আবার নীচের দিকে চাইলুম। বড় একখানা জাহাজ—খালাসীরা কিলবিল করছে। ওদের কাপড় দেখেছেন? যেন চাই-নিজ-ব্লাকে ছোপান, কিন্তু ও চাইনিজ-ব্লাক নয়, ও কয়লার কালি। ওরা সাদা কাপড় চোখে দেখে না—না, না, চোখে দেখে। যাত্রীরা তো সাদা কাপড় পরে, তাই দেখে—কিন্তু

নিজেরা পরেনা। ওরা কল চালায়, সিঁড়ি টানে, ডেক ধোয়, কয়লা জোগায়। বয়লারের নীচেকার অগ্নিকুণ্ড তুটো দেখেছেন তো—হরিণের মাংসও বোধ হয় এখানে এক নিমিষে সেদ্ধ হয়ে যায়, ওরা তো মানুষ। অথচ ওরা কত পায় জানেন? গড়ে মাসে পনেরো টাকা। ঐযে ধোঁয়া উঠছে চোং দিয়ে, ওতে ওদের বাষ্পীভূত রক্ত মেশানো! মনকে সান্ত্বনা দিলুম, ভারত যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন ওদের মাইনে হবে কম করে এক-একশো টাকা।

জোরে জোরে পা চালিয়ে এগোতে লাগলুম, এসব করুণ দৃশ্য যেন অসহ্য হচ্ছে!

ওপারের কাছাকাছি এসে গঙ্গার ঘাটের দিকে চোখ পড়লো। লোকের অসম্ভব ভিড়! রাগে গা রি রি করে উঠলো। আমি যদি মুসোলিনী হতুম তবে আইন করে বন্ধ করতুম এ ব্যবসাদারী গঙ্গাস্নান। হাঁ, ব্যবসা, ব্যবসা বই কি! একদল করে ধর্মদানের ব্যবসা। আর একদল করে বাইরের জলে মনের পাপ ধুয়ে দেবার ব্যবসা। চমৎকার! ধর্ম-বিদ্রোহী ভলটেয়ারের সেই কথাটা মনে পড়লো, গঙ্গা তীর্থ, সিন্দুনদ তীর্থ, ইউফ্রেটিস তীর্থ, কিন্তু নীল নদী তীর্থ নয়। কারণ? কারণ প্রথমগুলিতে কুমীর নেই, নীলনদীতে ভয়ানক কুমীরের উপদ্রব!

শুনলুম, চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে, তাই লোকের এতো ভিড়। বটে! বিজ্ঞান যাকে মিথ্যা বলে হাজারবার প্রমাণ করে দিয়েছে, তা সত্য বলে চালিয়ে দেওয়ার অপশক্তি ধর্মের কমবে কবে? কতদিন আর ধর্ম নিয়ে এ জোচ্চোরি কারবার চলবে? সংকল্প করলুম, ভারতবর্ষ স্বাধীন হক, তখন এর বিরুদ্ধে আইন করার প্রস্তাব আর কেউ না হক, আমি তুলব।

পোলের গোড়াটার পথ অপেক্ষাকৃত সরু, বড্ড ভিড় সেখানটায়। আমার মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠলো। আচ্ছা, আপনারা ভিড়টা কেমন পছন্দ করেন? মোটেই না! আমার কিন্তু বেশ লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই অনেক সময় ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকি, ঠেলাঠেলি করে চলি, মানুষের গায়ে অকারণ গা ঠেকাই। বেশ লাগে, এযে মানুষের স্পর্শ।

বেশ চলেছি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হল—সামনে ভিড় জমে গেছে, তুমুল ব্যাপার! এক মেছুনীর সঙ্গে এক ভট্‌চায্যির ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে। ভট্‌চায্যি মুহূর্তে অপবিত্র হয়ে গেছেন। আচ্ছা, কোনখানটায় উনি অপবিত্র হলেন? দেহে? মেছুনী কালো কিন্তু তার চাইতেও কালো বামুনতো ওর চারপাশেই আছে। মেছুনী কালো

না হয়ে সাদা চাঁপা ফুলের মতো রং, তরুণ, বিলাস কটাক্ষময়ী হলে বোধ হয় ঠাকুরের আপত্তি হতনা—আর যদি চণ্ডীদাসের সেই রামী ধোপানী এসে হাজির হত তবে বোধ হয় উনি লুপেই নিতেন। কিন্তু আমি ভাবছি, ওর অশুচি হল কোথায়? অবশ্য বেশিক্ষণ এ সংশয়ে তুলতে হলনা—ওর মুখের বাছাই বাছাই গাল-গুলো শুনে বুঝলুম, ওঁর মুখ অপবিত্র হয়েছে এবং অপবিত্র হয়েছে ওর মন। আর মনে রাখবেন, তাও গঙ্গার উপর দাঁড়িয়ে—নীচুতে গঙ্গার জল উছলে উছলে যাচ্ছিল।

বিরক্তিভরে লোক ঠেলে এগোলুম সামনে। হাওড়া পুলের এদিকে। সেখানটার কথা জানেনই তো—গোটা পাঁচ-ছয়েক রাস্তা এসে মিশেছে—আর গাড়ী ঘোড়ার কি ভিড়। লোক চলবে, না গাড়ি চলবে?

আমি কিন্তু সিপাইজির সাহচর্যের দৌলতে নিরা-পদেই চললুম। হঠাৎ একটা বুকফাটা চীৎকার শুনে ফিরে দেখি, এক যুবক গাড়ি চাপা পড়েছে। গাড়ির চাকা দুটো তার গলার উপর দিয়ে চলে গেছে—ঝলক ঝলক রক্ত উঠছে মুখ দিয়ে—আর এক তরুণী যুবকেরই স্ত্রী মূর্চ্ছিতা তারই পাশে। পলকে ভিড় জমে গেলো।

পাহারাওয়ালাটিরও বোধ করি মন গ'লে গিয়েছিল এ করুণ দৃশ্যে। আমরা মৌন নির্ণিমেষে দেখতে লাগলুম যুবকের মৃত্যু-যন্ত্রণা। মোটরের আরোহী এক বড়লোক —তরুণীর হাতে তিনি দশখানা দশটাকার নোট গুঁজে দিলেন! একটা প্রাণের দাম হ'ল একশো টাকা! হায় গর্বিতা ধনী! তুমি একটু দ্রুত যাবার গরবে একটা প্রাণকে ধ্বংস করে রেখে গেলে। শুধু কি একটা প্রাণ! তুমি তরুণের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেছ এই তরুণীকে, এক পরিবারকে—দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে যে সব কর্মী তাদের একজনকে। অলসের হাতে নিহত হ'ল কর্মী।— আর তার ক্ষতিপূরণ একশো টাকা। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে এই ধনীর গলা টিপে ধরে পথের ধূলোয় ফেলে হু'পা দিয়ে মাড়াই, আর কৈফিয়ৎ চাই—ঐ নোটগুলি তার মুখে গুঁজে দিই। এমন দিন কি হবেনা যেদিন ধনী বুঝবে তার মোটরে চড়ার চাইতে ঢের বেশি দরকার পথিকের পথ চলা? হবে, হবে। সে স্বাধীনতার সুদিন আসছে! ধনী তরুণকে এবং তরুণীকে মোটরে তুলে নিয়ে হাঁসপাতালের দিকে চলে গেলো, আমি আবার শুরু করলুম পথ চলা।

মেড়ো ভাইদের এক খাবারের দোকানের সামনে

এসে দেখি মারামারির উপক্রম। একটি ক্রেতা খাবার কিনেছিল—তার ধারণা ছিল তু'পয়সা তার দাম, কিন্তু দাম চার পয়সা। ক্রেতা ফেরৎ দিতে চায়, বলে, আমার কাছে তু'পয়সার বেশীতো নাই। দোকানদার ফেরৎ নেবেনা, বলে ও মুসলমান, ওর ছোঁয়া কে নেবে--এই নিয়ে গণ্ডগোল। হায়! হায়! চিরকালটাই তাহলে এই রকম চলবে। আচ্ছা, এই মেড়ো ভায়ারা তো একরকম গান্ধীজির মুল্লুকেরই লোক, আর গান্ধীজির চেলাও এরা জবরদস্ত—শ্রীরামচন্দ্রের চেলা যেমন হনুমান। এরা তবে গান্ধীজির হিন্দু-মুসলমান ঐক্যনীতি মানে না কেন? নীতিটা কি শুধু আসর সভা প্লাটফর্ম্ম পেপারের জন্য; তাই হবে।

বাবা, একি জোড়াতালি দেওয়ার কাজ? চাই মনের মিল, সম্পূর্ণ সাম্য। তোমরা কি কর? না, মুখে বল, হিন্দুমুসলমান এক মায়ের সন্তান, ভোট আদায় করার বেলা আরো গোলে পড়। আর কাজের বেলা? সভয়ে বলো, বাবা এক হব বলে কি হিন্দুত্ব খোয়াব? ইণ্টার-ডাইনিং, ইণ্টারম্যারেজ চালাব? তা হবেনা। একটা গল্প মনে পড়লো; পাড়াগাঁয়ে এক পাদরী বহু নমশূদ্রকে ধরে খৃস্টান বানিয়ে ফেললেন। তার কাজ ঐখানেই সারা হল। তিনি শহরে চলে এলেন। পরের বছর আবার সেই গাঁয়ে গেছেন।

গিয়ে দেখেন, তার চেলারা পূজো করছে। "একি সর্বনাশ, তোমরা কি করছ?" "আজ্ঞে, দেখতেই তো পাচ্ছেন পূজো।" "বল কি, খৃস্টান হয়ে পূজো।" গাঁয়ের মোড়ল তখন চটে গিয়ে বললো, "বাঃ রে সাহেব, খৃস্টান হয়েছি বলে কি বাপদাদার আমলের পূজোও ছাড়বো?"—বাবা, তোমরাও হয়েছ তাই। হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানের দেয়ালটাকেও বজায় রাখবে আর মিলনের বুলিও কপচাবে। বাহবা!

শুনচি নাকি, জাত সব দেশেই আছে। বেশ যুক্তি কিন্তু। সবাই কচুপোড়া খায়, আমরা খাবনা কেন? খাও বাবা, যত পার খাও, কিন্তু ঐটুকুতেই থামো কেন? বিলিতি বিবিরাতো বল নাচে,—তোমরাও একবার নেচে দেখলে পারো। তাছাড়া, কথা কি জান—অন্যান্য দেশে জাতিভেদ থাকতে পারে কিন্তু সেটা social, religious নয়। পাশ্চাত্যে আজ যে মুচি, কাল সে জজ হ'লে তার মুচিত্ব ঘুচে যাবে; কিন্তু তোমাদের মুচি জজ হলেও মুচিই থাকবে। তোমরা হয়তো তার খোসামোদ তখন করবে, আবার বাইরে বেরিয়ে তার মুচিত্বের কুচ্ছাও গাইবে। তোমাদের হাল আমি বেশ জানি,···দাঁড়াও, একবার স্বাধীনতা পেয়ে নিই।

অনেকটা দূর এগিয়ে গেলুম—গঙ্গার ধার দিয়ে। একটা কলের কাছে কুলি-মজুরের দল সমবেত হ'য়েছে। আর একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন। কয়েকটা কথা কানে এলো, "আমাদের দুঃখ আর কেউ ঘুচাতে পারবে না, পারব একমাত্র আমরা। ছেলে মেয়ে বুড়ো এই যে দশঘণ্টা ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে, এই যে গায়ের রক্ত জল কচ্ছে তাতে লাভবান হচ্ছে কারা—ঐ ধনিকের দল। আমরা যে আঁধারে, সে আঁধারে···"এইটুকু বলেছেন" আর গুলির আওয়াজ এলো। এতদিন সে দৃশ্য খবরের কাগজেই পড়েছি, আজ স্বচক্ষে দেখলুম। দেখলুম, শ্রোতৃবৃন্দ গুলি খেয়ে দু'হাত দিয়ে যতটা পারে শরীর আবৃত করে যে যেদিকে পারে ছুটছে। যারা পারলো না, তারা অনেকে সেইখানে চিরদিনের মতো লুটিয়ে পড়লো। জানি, ওদের ভাগ্য এই। ওদের দাবির জবাব—জুলুম। ওদের প্রতিবাদের জবাব—গুলি। চিরকালটাই এই হয়ে আসছে। কবে এর প্রতিকার হবে?······দেশ স্বাধীন হলে।

মনটা অব্যক্ত বেদনায় রাঙা হয়ে উঠলো। চোখ হয়ে উঠলো আরও সজাগ। দেখলুম, দুনিয়া সেই একই

তালে চলেছে। কেউ ছিন্নবসনধারী, জীর্ণকুটিরবাসী—কেউ রাজপ্রাসাদে থাকে, রাজবেশ পরিধান ক'রে বিলাস-ব্যসনে জলের মতো পয়সা ওড়ায়। কেউ ভিক্ষা করে, কেউ ফুটপাথের ওপর পড়ে অসহ্য রোগযন্ত্রণায় চীৎকার করে, শোনার লোক কোথায়? কেউ ফুর্তি করে, কারো মুখ মলিন। দুনিয়া চলেছে চিরন্তন অসাম্য, অত্যাচার, অবিচারের ওপর।

লালবাজার থানায় এলুম। একটা বড় ঘরে আমার ঠাঁই হল। দেখি, আগে থেকেই সেখানে মজলিস বসে গেছে। আমিও গিয়ে তাদের কাছ ঘিসে বসে গল্প জুড়ে দিলুম। এটা আমার চিরকেলে অভ্যেস। আমার এক আত্মীয় ছিলেন জেলার। তাঁর দয়ায় আমি এমন অনেকবার কয়েদীদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি, আর খুব ভালো লেগেছে মিশে। আপনারা লাইব্রেরী থেকে ইতিহাস নিয়ে পুরাতন, প্রাচীন গৌরবের কথা পড়ে মুগ্ধ হন। আমি জেলখানায় বসে বর্তমানের এই জীবন্ত ইতিহাস পড়ে দেশের দুর্দশার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে চোখের জল ফেলেছি। এরা দূরদূরান্তর থেকে, বহু স্থান থেকে, বিভিন্ন সমাজ থেকে আসে। এদের এক একজনের কাহিনী এক-এক রকম। এদের নাড়ি

টিপে সমাজের খাঁটি অবস্থা বোঝা যায়।

কাজেই এ সুযোগ ছাড়লুম না। আলাপ জমিয়ে মনের কথা বার করার চেষ্টা করলুম। পারলুমও, কিন্তু সেই চিরন্তন দুঃখকাহিনী। এরা ইচ্ছে করে পাপ করেনি,—অভাব এদের পাপী করেছে, আইনের ব্যভিচার এদের পাপী করেছে, সমাজের অত্যাচার এদের পাপী করেছে। এ ছাড়া, খুঁটিনাটি অপরাধও ছিল বহুৎ। অনেকে এর আগে ধরা পড়েনি, জেল কি চিজ্ জানে না। ইচ্ছে হল জিনভলজিনের কথাটা এদের শোনাই। জিনভলজিন্ যখন জেলে গেল তখন তার চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠে, কারণ তখনও সে ভালো মানুষ ছিল: কিন্তু আঠারো বছর পরে জেল থেকে যখন সে বার হল, তখন তার চোখ শুষ্ক—একফোঁটা জল নেই—তখন সে ঘোরতর পাপী—জেল একটা ভালো মানুষকে অতি বড় পাপী করে ছেড়ে দিয়েছে। হায় কয়েদীদল, তোমাদেরও এই ভাগ্যলিপি! ভাগ্য ফিরবে দেশ স্বাধীন হলে। তখন তোমরা পাপ করতে বাধ্য হবেনা, তখন দণ্ড ভালকে খারাপ করবে না, খারাপকে ভালো করবে।...

যথাসময়ে বিচার শুরু হল।

অভিযোগ, আমি নাকি রেলকোম্পানীকে ঠকাবার মতলবে ছিলুম।

আমি যত বলি, না, কাল পাঁচটার সময় টিকিট কিনে বাবা তারকেশ্বরের কাছে যাচ্ছিলুম হত্যা দিতে, কেউ তা শোনেনা। ওরা সেই ছিঁড়ে-ফেলা টিকিটের টুকরাগুলো যুড়ে এনে এবং আরো অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করে প্রমাণ করলো, আমি নাকি একজন পাকা জুয়াচ্চোর। আমার শাস্তি হল তিনমাস জেল।

আমি আর সইতে পারলুম না। বলে ফেললুম, নিন মশাই, যত পারেন অত্যাচার করে নিন ইংরাজের মুল্লুকে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলে আইনের মার-প্যাঁচে ভালোমানুষকে আর দোষী সাজিয়ে জেলে পাঠাতে পারবেন না।

এ কথায় কোথায় সবাই রেগে উঠবে, না, দেখি কোর্টময় হাসির ধূম পড়ে গেছে। ব্যাপার কি? ওরা আমায় পাগল ঠাওরালে নাকি? বললুম, একি, মশাই, আমাকে কি পাগল পেয়েছেন?

জজসাহেব বললেন, নাগো, তুমি পাগল হবে কেন? কিন্তু ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হয়েছে কুড়িবছর হল ; এ খবরটাও কি তুমি রাখোনা?

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। মুখ দিয়ে কথাটি বেরুলোনা। এই স্বাধীন ভারতবর্ষ! আর আমি কুড়িবছর ঘুমিয়েছি!

হাসি এলো একটা কথা ভেবে। আচ্ছা, কোন্‌টা বেশি মজাদার? আমার ঘুম? না, এম্‌নিধারা স্বাধীন ভারতবর্ষ?

জেলে গেলুম।

সেই আগেকারই জেল—তফাৎ, নতুন কলি-ফেরানো হয়েছে মাত্র। দেশের দিকে চাইলুম। অবিকল আগেকার দেশের মতো অবস্থা, সেই আগেকারই দেশই রয়ে গেছে, —তফাৎ এর ওপরও কলি ফেরানো হয়েছে মাত্র।

তিন চালে কিস্তি মাৎ

ভোর না হতেই দাদাঠাকুরের বাড়ি থেকে ডাক এলো। দাদাঠাকুর বন্ধুলোক, কাজেই তিলবিলম্ব না করে এক দমে গিয়ে হাজির হলুম। দেখি, দাদাঠাকুর মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছেন। সুধোলুম, কি হয়েছে দাদাঠাকুর ?

তুমি এসেছ! বাঁচলুম! ওরে এক কলকে······

সে হবে 'খন, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো ?

আরে ভায়া, নব্‌নে শালাকে নিয়ে পড়েছি ভারি ফ্যাসাদে। বলে এতো ব্যাটাকে বাগে আনলুম, ও বলে কিনা, জমির মালিক আমি, তুমি নও!

বটে! এতবড়ো কথা!

জমিটা অবশ্য তার বাপদাদার আমলের।

আরে রাম! দাদাঠাকুর, জমি কারো নয় আজকাল-কার দিনে। যদি কারো হয় তবে যার জোর আছে তার। বুঝলেন, এই হচ্ছে দুনিয়ার নীতি।

দাদাঠাকুর খুশি হয়ে একগাল হেসে বললেন, তুমি না হলে, ভায়া, সত্য কথা বলে কে।

আমি বললুম, তা, আপনি এখন কি চান ? নবীনের সম্পত্তি ভুগিয়ে ভাগিয়ে ভোগ করতে চানতো ?

দাদাঠাকুর আর একগাল হেসে বললেন, বোঝই তো সব ভায়া। এবার একবার আইনের বইগুলো ঘেঁটে দেখো।

আমি বললুম, বলেন কি! পাগল হয়েছেন! একে মনসার চেলা, তায় ধূপের ধুঁয়ো। খবর্দার, অমন কাজটি করবেন না। আইনে ওকে বাগে পাবেন না।

কেন ?

আজ্ঞে, ও দুর্বল হলেও বোকা নয় ; আপনার আইন দিয়েই ও আপনাকে জব্দ করবে।

তবে উপায় ?

কোনো চিন্তা নেই। আইনের কথা তুলবেন না। আপনি যা করবেন তাকেই আইন বলে চালান। জমি নিয়ে নিন।

দাদাঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, তুমি বুঝতে পাচ্ছনা হে, জমি তো আমি বহুদিন আগে থেকেই দখল করে আসছি। কিন্তু ওর মনটাকে যে কোনোমতেই দখল করতে পারলুম না। ওযে আমার কুৎসা গেয়ে বেড়ায়।

বটে, বটে···আচ্ছা, এক কাজ করুন। ওকে ডেকে এনে আপনার স্কুলে ভর্তি করে দিন।

বল কি! শিক্ষা নেই, তাতেই এতো···

আহা, বুঝছেন না আপনি···আমি যা বলছি করুন না।

দাদাঠাকুর অগত্যা নবীনকে ধরে এনে স্কুলে ঢুকিয়ে তার শিক্ষার দিকে ভয়ানক মনোযোগ লাগিয়ে দিলেন।

মাস কয়েক পরে কি একটা কাজে দাদাঠাকুরের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম, দাদাঠাকুর এসে সবেগে জড়িয়ে ধরলেন।

ব্যাপার কি ?

আর ব্যাপার! একেবারে সর্বনাশ। নবনে এখন কোনো কথা বলতে কসুর করে না।

হেসে বললুম, বলেন কি।

হাঁ! তুমি হাসছ, এদিকে আমার যে সর্বনাশের জোগাড়।

মনে মনে বললুম, আমার পয়লা চাল ফলেছে, এইবার দোসরা চাল।

আপনি প্রচার করে দিন, আপনার বিরুদ্ধে কোনো কথা ও কইতে পারবেনা।

দাদাঠাকুর হতাশ হয়ে বললেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি লোক চরিয়ে খাও! আগে বরঞ্চ ও শুনলেও শুনতো, এখন আর শুনবে কেন?

শুনবে তো না-ই। আর তাই-তো আমি আশা করি। দাদাঠাকুর, যে কথা শোনে, তাকে ঠকানোও শক্ত, শাস্তি দেওয়াও শক্ত, বুঝলেন? মানুষকে শায়েস্তা করতে হলে আগে তার মধ্যে একটা অবাধ্যতা, একটা কথা কওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করে নেওয়া চাই।

তাতো নব্‌নের মধ্যে ষোল আনাই হয়েছে।

হয়েছে তো, বাস্—এইবার আইন চালিয়ে দিন, আপনার বিরুদ্ধে কথা কইলেই দণ্ড।

তারপর?

তারপর—দেখুন না কি হয়।

দাদাঠাকুর বললেন, তা না হয় করছি, কিন্তু তুমি পরশুদিন এসো!

দিনমত গিয়ে দেখি খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো দাদা-ঠাকুর ক্রমাগত পাইচারি করছেন বারান্দায়।

আমি নমস্কার করে দাঁড়াতেই দাদাঠাকুরও স্থির

হয়ে দাঁড়ালেন। অন্যদিন তার মুখে খই ফোটে—আজ তিনি নির্বাক। বললুম, ব্যাপার কি ? আইন জারি করেছিলেন ?

হাঁ।

নব্‌নে শোনেনি তো ?

না।

বাস্! তারপর ?

তারপর তাকে ধরে আনলুম।

উৎসাহিত হয়ে বললুম, কড়া শাস্তি দিলেন তারপর ?

না।

ভুল করেছেন। এসব বদ্‌মাইসকে..........................

দাদাঠাকুর আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে বললেন, আমি তাকে একদম ছেড়ে দিয়েছি !

করেছেন কি ?

ও ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

কেন ?

ওকে যত ধমকিয়েছি, ও শুধু এককথা বলেছে, 'আমি একবর্ণ মিছে কথা বলিনি।' সত্যের ওপর আমি কি করে আর কি করি ?

আমি প্রথমটা হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে

পড়লুম। তারপর মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেলো। উল্লসিত হলুম,—এইবার তেসরা চাল!

বললুম, আইনটাকে সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করে নিন।

কি রকম ?

রকম আর কি ? আপনার বিরুদ্ধে কিছু বললেই শাস্তি। তা হক না সে হাজারবার সত্য।

অর্থাৎ সত্যকথা বলারও অধিকার কেড়ে নেব ?

অবিকল ?

কিন্তু সত্য ও বলবেই।

নিশ্চয় !

তবে ?

শাস্তি ত ও পাবেই এবং জমিও আপনার বেদখল হবেনা।

কিন্তু ও ব্যাটা যদি না শোনে কথা।

আমি বললুম, তাহলে কি করতে হবে, তাও কি আপনাকে বলে দিতে হবে ?

উত্তরে দাদাঠাকুর তার হাতের মোটা লাঠিগাছটার ওপর ভর দিয়ে এতোদিন পরে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন।

আমিও হাসিতে যোগ দেব···হঠাৎ নব্নে শালার দিকে চোখ পড়ল—আর হাসতে ভরসা হল না···ওর হাতেও একগাছা লাঠি—প্রতিবাদ মুখ ছাড়িয়ে যে ওর লাঠিতে উঠবে এটাতো জানাই ছিল।

পালালুম!

তিন চালে কিস্তি মাৎ হবে ঠিকই, কিন্তু কোন্পক্ষের তা দাদাঠাকুরের মাথায় না ঢুকলেও আমার বুঝতে বাকি রইলনা।

সর্বজনীন

সেদিন ভারি ফ্যাসাদেই পড়েছিলুম। পাড়ায় সর্বজনীন দুর্গাপূজোর এক পাণ্ডা চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে হাজির।

আসল কথা জানেন কি মশাই, আমি নাস্তিক; ভগবানেই বিশ্বাস নেই, তারপর তো দুর্গাপূজো। কিন্তু সে কথাটা বলে এই সকালবেলায় একটা ঝগড়াঝাটি বাধাবার ইচ্ছে নেই। পয়সাও বার করবনা, কাজেই, তর্ক জুড়ে দিলুম।

মশাই, আপনারা পূজো করেন কেন?

তা কি আর আপনি জানেন না? এ শক্তি পূজো, শক্তি লাভ হবে।

বটে। কিন্তু সর্বজনীন নাম হল কেন?

সকল জাত মিলে পূজো করব।

সকল জাত—কোন্ কোন্ জাত।

কোন জাত বাদ নেই, নাম আর কি করব।

মুসলমান, খৃস্টান—তারাও তা'হলে আছে?

তারা থাকবে কেন? তারা তো হিন্দু নয়! পূজো তারা জানেই-না।

মনে করুন, লাঠিখেলা-দেখার কৌতূহলে তারা আপনাদের পূজাস্থানে গিয়া ঘট ছুঁয়ে ফেললে।

বা, তা কখনো সম্ভব হয়!

কিন্তু হ'য়ে পড়লে আপনারা কি করেন?

মশাই ওসব অসম্ভব কথা আমরা ভাবিনি।

অর্থাৎ মুসলমান খৃস্টান এসব সর্বজনীনের ভিতর পড়েনা?

না।

আপনাদের সর্বজনীনতারও তাহলে গণ্ডি আছে?

নিশ্চয়ই।

বেশ কথা, কিন্তু মশাই, শক্তিলাভের জন্য সর্বজনীন পূজোর দরকার কি? ঘরে ঘরে পূজো করলে কি শক্তি লাভ হয় না?

বা, তা হবেনা কেন, কিন্তু—

হ্যাঁ, সেই কিন্তুটা কি ভেঙে বলুন।

দেখতেই তো পাচ্ছেন মশাই, দেশময় আজ অস্পৃশ্যতা দূর করার আন্দোলন চলছে।

ও, তাহ'লে আপনাদের পূজো অস্পৃশ্যতা দূর করার একটা উপায় ?

হ্যাঁ, কতকটা তা বৈকি।

কতকটা মানে ? আরো কোনো উদ্দেশ্য আছে নাকি ?

আছে বৈকি। মায়ের পূজোয় সব ভাই মিলিত হ'লে একটা মিলিত শক্তির সৃষ্টি হয়, একথা মানেন তো ?

নিশ্চয়, কিন্তু সব ভাই বলবেন না, বলুন, সব হিন্দুভাই; আর হিন্দুরা মিলবে এ ধরে নিলেও বর্তমান সমস্যার সমাধান হয়না। মুসলমান, খৃস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন এদের সঙ্গে মিলন হ'লে তবে বলতে পারি, ভারতমাতার সন্তানরা মিলিত হয়েছে। আপনাদের পূজোটা মনে করেছিলুম, রাজনৈতিক কিন্তু এখন দেখছি এটা তা নয় ; এটা সাম্প্রদায়িক ; আর সাম্প্রদায়িক সমস্যাও এতে মিটবে বলে আমার তো মশাই মনে হয়না।

কেন ?

আচ্ছা, আপনিই বলুন, মিলন আপনারা চান কেন ?

শক্তির জন্য।

তা জানি, ও একটা abstract কথা না বলে শক্তি দিয়ে কি করবেন, তাই খুলে বলুন।

দেশের কাজ ক'রব।

অর্থাৎ আপনারা যে স্বাধীনতা চান, ছোট-বড় সব হিন্দুকে তার সাধনায় ব্রতী করবেন ?

হাঁ।

আচ্ছা, ধ'রে নিন, দেশ স্বাধীন হল, তারপর ? তারপর কি তথাকথিত নীচু জাতদের আপনারা আপনাদের সঙ্গে সামাজিকভাবে একেবারে মিলিয়ে নেবেন ?

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ আহারে, এবং বিবাহেও কি সব জাত পরস্পর সম্পর্কিত হবে ?

সে সব ভবিষ্যতে সমাধান করা যাবে, আর অস্পৃশ্যতা দূর করা মানে তো তা নয়।

ও, তাহলে বর্তমানে আপনারা নীচু জাতদের ছুঁয়ে এবং ছুঁতে দিয়ে কৃতার্থ করবেন ?

তার মানে ?

মানে খুব সোজা। ভবি অত সহজে ভোলে না। ছোট যাদের বলেন, তারা নিজেদের ছোট তত মনে করেনা, যত মনে করে অত্যাচারিত, অসাম্য-পীড়িত। তারা মিলন চায় ষোল-আনা। এক আনার লোভ দেখিয়ে তাদের দলে টানতে পারেন, কিন্তু রাখতে পারবেন না। সে

মিলন মিলনই নয় যাতে ও ছোট এ ভাবটা থেকেই যায়।

আপনি কি চান তাহলে বামুন এখনই তার মেয়েকে কায়েতের হাতে তুলে দেবেন ?

আমি কি চাই না চাই, তা পরে বলব। কিন্তু যাদের আপনারা দলে টানছেন, তারা তাই চায়, এবং চাওয়াটা তাদের অন্যায়ও নয়।

অন্যায় নয় ?

না। মিলন তিন রকমের আছে। আমরা সবাই ভাই-ভাই—এটা মৌখিক মিল। আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একাসনে বসতে পারি, ছোঁয়াছুঁয়ি করতে পারি, এটা বাহ্যিক মিল। খাঁটি মিল হচ্ছে—বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার। মৌখিক এবং বাহ্যিক মিলে ছোটরা খুশি হবেনা। ওদের দরকার খাঁটি মিল। তা মঞ্জুর করতে আপনারা প্রস্তুত আছেন ?

না, আমরা অত বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী নই।

তা জানি। সেইজন্যেই তো এত প্রশ্ন।

কেন, বিয়ে না হ'লে কি মিল হয় না ? এ তো ভারি মুসকিলের ব্যাপার। একজনের সঙ্গে মিল-মিশ করতে হলেই কি তার সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে হবে ?

না, তা নয়। তবে তার আর আপনার বোনের মধ্যে যদি ভালোবাসা হয়, তখন বিয়ে হওয়ার বিধানটা বেশ পাকাপাকি করে জারি ক'রে রাখতে হবে।

যদি না করি ?

তবে মৌখিক এবং বাহ্যিক মিলই থাকবে চিরকাল—খাঁটি মিলও হবেনা, রাজনৈতিক মিলও হবেনা। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান তো মারামারি ক'রবেই, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, ধোপা, নাপিত, ডোম, চাঁড়াল এরাও মারামারি করবে। ঠেকাতে পারবেন না।

মশাই, অত বকবেন না। কোন্‌দেশে জাতিভেদ নেই ?

সব দেশেই আছে।

তবে ?

তবে একটু তফাৎ আছে।

কি ?

অন্যান্য দেশে জাতিভেদটার ভিত্তি একমাত্র ধন-বৈষম্যের ওপর। মুচি একজাত, মেথর একজাত, ধনী একজাত ইত্যাদি। কিন্তু এ কায়েমি জাতিভেদ নয়। মুচি জজ হ'লে তার মুচি-জাতিত্ব আর থাকেনা—সে দশের জাতিতে ওঠে। কিন্তু আপনাদের দেশে গীতা, মনু ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্র বিধান দিয়ে রেখেছে, মুচি মুচিই থাকবে চিরকাল। সে ধার্মিক

হ'তে পারে। তার জন্য তার স্বর্গলাভ হবে, মুক্তিলাভ হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব লাভ হবে না। আপনাদের দেশের জাত ধর্মমূলক, বুঝলেন ?

এতো বুঝলুম। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, তাই বুঝলুম না। আপনি বলেন, হিন্দুধর্মটাকে রসাতলে পাঠালেই জাত উঠে যাবে ?

না, তা মনে করব কেন ? ধর্মটাকে একদম্ রসাতলে না হক, কিছু তলে তো পাঠানো চাই-ই, কিন্তু তারপরেও আরও কিছু চাই।

আবার কি চাই ?

সমাজের একটা ওলোট-পালোট।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ সমাজে যে ধন-বৈষম্য, ভোগ-বৈষম্য অধিকার-বৈষম্য আছে, তা দূর করতে হবে।

বুঝেছি, আপনি সাম্যবাদী। কিন্তু ধন-বৈষম্যের সঙ্গে জাতিভেদের কি সম্পর্ক আছে, তাতো বুঝতে পারলুম না।

বোঝার চেষ্টা করেন না কিনা কোনোদিন, তাই। অতো ভণিতা না ক'রে আপনিই বুঝিয়ে দিন না মশাই। এইতো আমাদের রাখালদাস বাবু ধনী, কিন্তু

কি সদাশয় সাম্যবাদী লোক দেখুন তো। মধু-সমাজ স্থাপন করে জাতিভেদ তোলার জন্যই কী চেষ্টাই না তিনি কচ্ছেন !

সাধু! সাধু! আপনার রাখালদাস বাবুকেই ধরা যাক্। উনি সদাশয়, হাঁ! তা হয়তো হবেন, কিন্তু সাম্যবাদী নন্।

কেন ?

কারণ, হ'তে পারেন না।

কেন ?

জবাব দিচ্ছি। ওর বাড়িতে চাকর আছে ?

হাঁ—পাঁচ ছ'জন।

চাকর মানে কি জানেন ? কি ধরণের জীবন তারা পাত করে, তার খবর রাখেন ?

হাঁ…তা…

আচ্ছা, কখনো দেখেছেন রাখালদাস বাবু চাকরের সঙ্গে এক আসনে বসেছেন,—সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে যেমন কথা বলেন তেমনি কথা বলেছেন, দেখেননি ?

না। আর চাকরকে অতো আস্কারা দিলে মাথায় উঠবে যে। আর মানতে চাইবে না।

আস্কারা নয়, বলুন, অধিকার। তা'হলেই কথাটা

ধর্ম পুরোপুরি কচ্ছিনে মানে ?

কই কচ্ছেন ? আদি শাস্ত্রে যাই থাক্, সর্বত্র প্রচলিত পরবর্তী শাস্ত্রে পূজার অধিকার ব্রাহ্মণের। আপনারা শূদ্রকে দিয়ে, কায়েতকে দিয়ে পূজো করাচ্ছেন।

আপনার আপত্তি আছে কিছু এতে ?

হাঁ, আছে বই কি। শাস্ত্রের অন্য সব বিধান যদি অভ্রান্ত ব'লে অন্ধভাবে মানতে পারেন তো এটা মানবেন না কেন ? আর সব শাস্ত্র-বিধান সত্য, আর এইটেই তাহা মিথ্যা—কেননা, এটাকে মিথ্যা ব'লে প্রচার না করলে আপনাদের প্রচারণা চালাবার সুবিধা হয় না, নয় ?

কেন, আমরা কোন্‌গুলো অন্ধভাবে মানছি ?

পূজোর প্রত্যেকটা অঙ্গ আপনারা অন্ধভাবে মানেন। একটা বলি, ঠাকুরের চারদিকে লাল সুতো দিয়ে ঐ গণ্ডি দেন কেন ?

ঐ তো পূজাপদ্ধতি।

পূজাপদ্ধতি ব্রাহ্মণকে দিয়ে ভোগ রাঁধানোও—তার বেলা মানেননা, আর এর বেলা মানেন কেন ?

দেখুন মশাই, আপনার সঙ্গে বাজে বকার সময় নেই আমার। চাঁদা যা দেবেন দিয়ে দিন।

চাঁদা ! চাঁদা দেব—এমন আশ্বাস আপনাকে দিয়েছি বলেতো আমার স্মরণ হয় না।

এতক্ষণ চাঁদা পাবার আশায় আমার সব বাক্যবাণ খাতাধারী মহাশয় সহ্য কচ্ছিলেন, এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। গমগম্ ক'রে খাতা বগলে চেপে বেরিয়ে গেলেন, যেতে যেতে বলে গেলেন—নাস্তিক কোথাকার !

আমি গালগুলো নির্বিচারে হজম করলুম।
চাঁদা তো দিতে হ'লনা।

ক্লীব

বামুনের ছেলেও যে গো-মুখ্যু হ'তে পারে তার প্রমাণ কৃত্যাকৃত্য গাঙ্গুলি।

পাড়া-পড়শী ডাকে কেত্যা।

শত্রুরা আর একটু বাড়িয়ে বলে, কুত্তা।

স্বভাব ওজন ক'রে যদি নাম ফেরাবার রীতি থাকতো, তাহ'লে শত্রুদের দেওয়া নামটাই যে তার ভাগ্যে জুটতো, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কেত্যা গর্জন করতো খুব, কামড়াতো খুবই কম। তাও আবার লোক বুঝে।

একদিন জুয়ার আড্ডায় মদ এবং অর্থ উড়িয়ে সে বাড়ি ফিরছে। শ্মশানের মধ্য দিয়ে পথ। এক বেতালের সঙ্গে দেখা। কেত্যা তো ভয়ে থরহরি কম্পমান। বেতাল অনেক কষ্টে তার ভয় ভাঙ্গিয়ে শ্মশানের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো।

সেই থেকে কেত্যা শ্মশানেও আড্ডা দেয় মাঝে মাঝে।

একদিন বেতাল বন্ধু বললো, আমায় মানুষের মাংস এনে দে। শ্মশানে আজকাল দুর্ভিক্ষ, মরা আসে না।

কেত্যা বললো, মাংস এনে দেব! কিন্তু আমায় কি দেবে আগে বলো।

কি চাস?

মরা লোক বাঁচাবার মন্ত্র শেখাবে?

আচ্ছা, তাই সই। নিয়ে আয় মাংস। সদ্য-কাটা বামুনের তাজা মাংস চাই।

কেত্যা চ'লে গেলো লোকালয়ে।

সদ্য-কাটা বামুনের তাজা মাংস কোথায় পাওয়া যায়?

কেত্যা অনেক মাথা ঘামিয়ে দেখলো, তার বাড়িতেই আছে তা। সে তার নিদ্রিত ভাইকে কেটে নিয়ে গেলো শ্মশানে। বিনিময়ে বেতাল তাকে মন্ত্র শিখিয়ে দিলো।

পরদিন শ্মশানে একটি মড়া এলো। কেত্যা সেটার উপর মন্ত্র প্রয়োগ করতে গেলো। মন্ত্রের শ্লোক উচ্চারণ করলো, আর অমনি একটা হাত নড়ে উঠলো। কেত্যা একটু সরে গিয়ে আরো শ্লোক আওড়াতে লাগলো। দেখতে দেখতে মড়াটার পা দুটো, আর চোখটা নড়ে উঠলো। কী বীভৎস দৃষ্টি সে চোখে!

'বাবাগো' ব'লে কেত্যা উঠে দিলো দৌড়। সেই মড়াটাও ছুটলো তার পিছু পিছু।

শ্মশান না পেরুতেই কেত্যার প্রাণ গেলো সেই মড়াটার হাতে। মরার সময় কেত্যা মিনতি করে বললো, আমায় মেরোনা। আমি কি দোষ করেছি যে মরছি ?

বেতাল-বন্ধু কোথা থেকে লাফিয়ে এসে বললো— শোনো, তুমি কি দোষ করেছো! তুমি পাপ করতেও ভয় পেলে, পুণ্য করতেও সাহস পেলে না। তুমি পাপীও না, পুণ্যাত্মাও না, তুমি ক্লীব। তোমার মরাই উচিত। ভয়, দুর্বলতা, পাপপুণ্যে আপোষের চেষ্টা— এই-ই ক্লীবত্ব, এই-ই মৃত্যুর লক্ষণ।

—সংসার সাগর মন্থনম্।

স্বর্গাদপি

সে বড় বেশিদিনের কথা নয়। স্বর্গে দেব-সভায় সেদিন ভারি চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। সব চেয়ে খাপ্পা হয়েছেন ইন্দ্ররাজ। আগে দেবরাজের ছিল একমাত্র মামলা...... স্বর্গরাজ্য তপোবলে অপহরণ করার চেষ্টা...১২১ ধারা...... তাতে আদালতে নালিশ করার বড় একটা দরকার হতনা। উর্বশী, ঘৃতাচী, রম্ভা ইত্যাদি যে কোনো একজনকে পাঠিয়ে আসামীর তপোভঙ্গ করলেই চলতো।

এবার ভিন্ন ধরণের বিপদ........ডিফামেশনের মামলা। স্বর্গের বিরুদ্ধে ডিফামেশন। কথায় কথায় কেবল, স্বর্গাদপি গরিয়সী, অসহ্য। প্রেস-অর্ডিনান্স জারি করে এ লেখার পথ বন্ধ করা দরকার, আর মুখ বন্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা। স্বর্গের চাইতে বড়, একথা কেউ আর বলতে বা লিখতে পারবেনা।

নারদ ঠাকুর হাজির ছিলেন সেখানে, বললেন, দেবরাজ, স্বর্গাদপি তো তবু ভালো,......এর চাইতেও ভীষণ কথা যে চলেছে তার খবর রাখেন?

কি? কি?

সমগ্র দেবসভা শ্রবণোন্মুখ হ'য়ে উঠলো।

নারদ বললেন, এক মোগলাই বাদ্‌শা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে দেওয়ান-ই-খাস বলে একটা চমৎকার সৌধ নির্মাণ করে তার গায়ে খোদাই করে রেখেছেন, কোথাও যদি স্বর্গ থাকে তো তা এইখানে, এইখানে, এইখানে। অর্থাৎ পৃথিবীই স্বর্গ।

কী সর্বনাশ! ডিফামেশন ক্রমে ক্রমে পরিণত হল ডেস্ট্রাক্‌সনে।

অবিলম্বে এর বিহিত করা চাই।

ঠিক হল মামলা দায়ের হবে।

কিন্তু আসামী কে?

সেই বাদ্‌শা।

নারদের কাছে নাম জিগ্যেস করলে তিনি বললেন, তার নাম শা-জাহান।

বৃহস্পতি নোট করে নিলেন, শা-জাহান, পিতা মৃত... ...জাহাঙ্গীর। কিন্তু......

কিন্তু কি?

শা-জাহান নিজেও মৃত।

বৃহস্পতি হতাশ হ'য়ে পড়লেন। ইন্দ্র বললেন, মৃত— তাতে কি হ'ল, তাকে নরক থেকে ধরে নিয়ে আসবো।

নারদ হেসে বললেন, আজ্ঞে দেবরাজ, শা-জাহান নরকে যাননি, বেহেশ্‌তে গেছেন,···মুসলমানদের বেহেশ্‌তে আপনার এক্তার চলবে না।

বৃহস্পতি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা, শাজাহান যাক, স্বর্গাদপি গরিয়সী······ঐ কথাটা কে লিখেছিল ?

বাল্মীকি মুনি।

বৃহস্পতি বিরক্ত হ'য়ে বললেন, বাল্মীকি শেষে এই করলো।

ইন্দ্রদেব বললেন, কিন্তু বাল্মীকি বলে ছাড়া হবেনা। আইনের চক্ষে সবাই সমান। করুন বাল্মীকিকে আসামী।

বৃহস্পতি ঠাকুরও বললেন, নিশ্চয়।

নারদ বললেন, কিন্তু গরীবের একটা নিবেদন ছিল।

কি ?

বাল্মীকিকে বড় সোজা পাত্তর ঠাওরাবেন না। তাঁকে ডাকাতের বেশেও দেখেছি, জবর ডাকাত। আবার কবির বেশেও দেখেছি, রামায়ণের মতো অমন ভীষণ একখানা মহাকাব্য রচনা ক'রে ফেললেন। তার জেরার সামনে আপনারা দাঁড়াতে পারবেন না। কেলেঙ্কারী রটার

যতটুকু-বা বাকি ছিল, তা এবার পূর্ণ হবে।

তবে তুমি কি করতে বলো?

একটা তদন্ত-কমিটি বসান। তারা নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট দেবে, মর্ত্য কতদূর স্বর্গের সমান বা স্বর্গের শ্রেষ্ঠতর হয়েছে।

নারদের প্রস্তাব গৃহীত হল। তদন্ত-কমিটি গঠিত হল। নারদই হলেন কমিটির প্রধান পাণ্ডা। তাঁর সঙ্গে বৃহস্পতি এবং দেবরাজও চললেন।

* * * *

প্রথমেই তাঁরা ঢুকলেন এসে বাঙলার একটা পাড়া-গাঁয়।

ইন্দ্র হলেন রাজা, সৌখীন। এদিক-ওদিক চেয়ে নারদকে জিজ্ঞেস করলেন, পথ কই?

তাইতো, পথ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। চারদিকে বন, আর ধানের ক্ষেত। দেবত্রয় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। ভ্যাগিস একটা লোকের সঙ্গে দেখা! লোকটার পেট বড়, মাথা ছোটো, হাত সরু, চোখ বসা, মাথায় একবস্তা কাপড়। তার কাছে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, আসুন, আমার সঙ্গে……বলে লোকটা সামনের একটা স্যাঁতসেতে বিলের মধ্যে পা দিল।

দেবতারা তো অবাক্। এই পথ!

জুতো পায় দিয়ে চলা দায়।

ইন্দ্র দস্তুরমতো চটে উঠলেন, এই তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী পথ, না!

নারদ বললেন, আজ্ঞে দেবরাজ, রাগ পরে করবেন, চট্‌পট্‌ জুতো ছেড়ে হাতে করে নিন। লোকটা আমাদের ফেলে চলে গেলো ব'লে।

মনের রাগ মনে চেপে দেবরাজ জুতো পায়ে এক হাঁটু কাদা ভেঙে এগিয়ে চললেন।

নারদ চুপ করে থাকতে পারেননা, গাইডের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।

তোমার নাম কি হে?

আজ্ঞে, যুধিষ্ঠির।

ইন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, কেন, যুধিষ্ঠির কি স্বর্গে ছিল না?···তার এ অবনতি···এ ভগ্নস্বাস্থ্য···

নারদ বললেন, দেবরাজ, এ দোসরা যুধিষ্ঠির।

ও করে কি?

লোকটি বললো, আমি ধোপা, কাপড় কাচি।

ইন্দ্র বললেন, এ নেহাৎ আপত্তিজনক। যুধিষ্ঠির নাম নিয়ে কাপড় কাচা আর পুষ্পোদ্যান নাম দিয়ে ধানের চাষ

করা এক কথা।

নারদ বললেন, আজ্ঞে, নামের গেরো দুনিয়ায় লেগেই আছে। সেবার আমি একগাঁয়ে এক গরিব জোলাকে দেখেছিলুম, সে তাঁত বোনে। তার নাম দেবেন্দ্র।

দেবরাজ পলকে লাল হয়ে উঠলেন রাগে।

কিন্তু রাগ প্রকাশ করার ফুরসুৎ ছিলনা, যুধিষ্ঠিরের বাড়ি এসে পড়েছে। দাওয়ায় বস্তা নামিয়ে যুধিষ্ঠির ডাক দিল, রূপী।

দেবরাজ ভাবলেন, রূপী···নামটা শুনে মনে হয় রূপের রাণী এর মেয়ে। নারদকে বললেন, আচ্ছা, রূপী কি উর্বশীর চাইতেও সুন্দরী ?

নারদের জবাবের অপেক্ষা না রেখে রূপী স্বয়ং এসেই সে সন্দেহ ভঞ্জন করলো,—দশবছরের একটি মেয়ে···কুৎসিতের হদ্দ···রোগাপানা···ও মেয়ে বলে না দিলে স্ত্রীজাতীয় বলে তাকে চেনার উপায় নেই এমনি পুরুষপানা গড়ন······ এসেই বাপকে বললো, ডি গুপ্ত এনেছ বাবা ?

না।

মেয়েটি আর কোনো প্রশ্ন না করে বস্তাটা টান্‌তে টান্‌তে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলো।

বৃহস্পতি বললেন, আচ্ছা, ডি গুপ্ত কে ?

একটা ম্যালেরিয়ার ওষুদ। মানুষ নয়।

ম্যালেরিয়া কি ?

একরকম রোগ। যুধিষ্ঠিরের যা হয়েছে। আর যুধিষ্ঠির কেন, বাঙলার বেশির ভাগ লোকই তো ও-রোগে ভুগছে।

ইন্দ্র উল্লসিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ···এই রোগা দেশের আবার বড়াই···স্বর্গাদপি······

বৃহস্পতি একমনে যুধিষ্ঠিরের কুঁড়ে ঘরখানি দেখ্‌ছিলেন, তারপর মনে মনে কি গবেষণা করে বললেন, আচ্ছা নারদ, যুধিষ্ঠিরকে কি কেউ বনবাস দিয়েছে ?

কেন বলুন তো !

দেখছোনা···দেখলেই বোঝা যায়···চাল থেকে খড় সবই একরকম ঝরে পড়েছে, দাওয়া ভাঙা, বেড়া খসে পড়ছে।

নারদ হেসে বললেন, এ এদের বাসস্থান।

বলো কি ! জল এলে কি করে ?

ভেজে।

ইন্দ্র আরো উল্লসিত হয়ে বললেন, ভিজবেনা, স্বর্গাদপি যে !

বৃহস্পতি বললেন, এ বোধ হয় অত্যন্ত গরিব।

আজ্ঞে, না। এর তবু যা হ'ক মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই আছে। এমন লাখো লাখো লোক আছে যাদের এটুকুও নেই, যারা কুকুরের মতো পথে পথে বেড়ায়।

বৃহস্পতি বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার তো!

ইন্দ্র বললেন সোল্লাসে, আশ্চর্যটা কিসের, এ যে স্বর্গাদপি…থুড়ি…স্বর্গ…

যুধিষ্ঠির বললো, রূপী, এক লোটা জল নিয়ে আয়, মা।

রূপী জল নিয়ে এসে যুধিষ্ঠিরের সামনে রাখলো।

ঘটিটি বেশ ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, কিন্তু ভিতরের জল ঘোলাটে…আর তা ছাড়া…বৃহস্পতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলেন তু-চারটে পোকাও ভাসছে তাতে। নারদকে বললেন, যা হ'ক পা ধোয়া যাবে।…

নারদ মৃতুস্বরে বললেন, আপনি বুঝি ভাবছেন, যুধিষ্ঠির অতিথিসৎকার করার জন্য মেয়ের কাছে পাদ্য চেয়েছে।

হাঁ…শাস্ত্রেও তো বলে…

…শাস্ত্রে কি বলে, তা পরে বলবেন, দেখুন,……

যুধিষ্ঠির ঢক্‌ঢক্ ক'রে সেই জল খাচ্ছে।

করো কি, ঐ জল খাচ্ছ?

যুধিষ্ঠির বললো, আজ্ঞে, আমরা এই জলই তো খাই।

কেন, তোমাদের গাঁয়ে সুপেয় জল নেই ?

আছে। চৌধুরী বাবুদের টিউব-ওয়েল, রাজেনবাবুদের দীঘি···বেশ জল—কিন্তু—

কিন্তু কি ?

—তা আমাদের ভাগ্যে নেই।

কেন ?

যুধিষ্ঠির হেসে বললো, সে জল যে আমরা ছুঁতে পারি না বাবু। আমরা যে ধোপা।

বা, জলতো মাটি ফুঁড়ে ওঠে, সবারই সমান এক্তার তাতে, কেন তবে তোমরা ছুঁতে পাবেনা ?

আজ্ঞে বাবু, আমরা জল-চল নই।

কেন ?

যুধিষ্ঠির কি জবাব দেবে খুঁজে পেল না।

বৃহস্পতি আবেগের সঙ্গে বললেন, মানো কেন এসব ! যারা তোমাদের জল অচল করে রেখেছে, তাদের অগ্রাহ্য করে জল আনো।

আজ্ঞে, মানুষের দোষ কি,—শাস্ত্রে যে নিষেধ

কি নিষেধ ?

যে, ধোপার জল ছুঁতে নেই।

বৃহস্পতি চটে উঠে বললেন, মাকে মামার বাড়ির গল্প

শুনিয়োনা, শাস্ত্রে এমন কথা থাকতে পারেনা।

নারদ বললেন, আজ্ঞে দেবগুরু, যুধিষ্ঠির কি মিথ্যে কথা বলতে পারে! শাস্ত্রে ইদানীং এমনি-সব কথাই আছে। তা নইলে বেচারারা কাছে জল থাকতে একক্রোশ দূরে বিলে জল আনতে যায়?

একক্রোশ দূরে, বলো কি!

যুধিষ্ঠির বললো, হাঁ, আর তাও কি সব সময় পাই! এইতো, এখন জল শুকিয়ে আসছে। জল ক্রমশ ঘোলা হবে।

এ গাঁ ছেড়ে যাওনা কেন?

যুধিষ্ঠির উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললো, বলেন কি বাবু, বাপ-পিতেমোর ভিটে ছেড়ে যাবো? এমন কুমতি যেন না হয়। আর তাও বলি, অন্য জায়গায় গিয়েও বা কি হবে। আমার সম্বন্ধী রাঘব সেদিন বলছিল, তাদের চন্দন গাঁ শ্মশান হবার দাখিল হয়েছে—জলের অভাবে। সর্বত্রই এই এক অবস্থা।

ইন্দ্র ফোড়ন দিয়ে বললেন, হবেনা, স্বর্গাদপি যে।

বৃহস্পতি বললেন, আচ্ছা যুধিষ্ঠির, তোমার ঘরের এ অবস্থা কেন?

আজ্ঞে, কি করব বলুন, জমিদারের টেক্স দিতে

পারিনা, ঘরের দিকে নজর দেবার সাধ্যি কোথায় ?

টেক্স দিয়োনা, আগে ঘর সারো।

যুধিষ্ঠির হেসে বললো, তাহ'লে জমিদার ঘরসুদ্ধ উৎখাৎ করবে। জানেন না তো নকড়ি বাবুকে ! সেবার কি একটা পরব উপলক্ষে মাথট দিতে না পারায় চন্দনগাঁয়ের হুকুড়ি প্রজাকে তিনি ভিটে ছাড়া করলেন।

বলো কি ? মানুষ যেদিন জন্মে সেইদিন থেকে তার মাটিতে থাকার অধিকার। তার যদি অর্থ থাকেতো তো কর দেবে। কিন্তু না থাকলেও মাটির স্বত্ব হ'তে বঞ্চিত তাকে কেউ করতে পারেনা।

নারদ বললেন, দেবগুরু, একটু আস্তে। আপনি দেখছি একটা বিপদ ঘটাবেন।

কেন ?

এইমাত্র যা আওড়াচ্ছিলেন, ও স্রেফ কমিউনিস্টদের কথা। শুনতে পেলেই কমিউনিস্ট মনে করে ১২১ ধারায় ফেলে দেবে। আর এই ব্যাচারীদের কর-বন্ধ আন্দোলনের অপরাধে তৈজসপত্র যা-কিছু আছে দশটাকার মাল দশ আনার দায়ে নীলাম হয়ে যাবে।

বৃহস্পতি ভয় পেয়ে চুপ করে গেলেন।

ইন্দ্র শুনেছিলেন, চণ্ডীদাস বলে কে একজন কেষ্টভজা

রামী ধোপানীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে মেলাই কবিতা রচনা করেছিল। সেই থেকে ধারণা, ধোপানী জাতটা ভারি সুন্দরী। যুধিষ্ঠিরের ধোপানীও না জানি কি রকমই দেখতে। বললেন, হাঁ হে যুধিষ্ঠির, তোমার ধোপানী কই ?

যুধিষ্ঠির চোখ তুলে একবার চাইলো ইন্দ্রের দিকে, তারপর বুক-ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো, রূপীর মা'র কথা বলছেন......

এইটুকু বলে যুধিষ্ঠির আর বলতে পারলো না।

ইন্দ্র ভাবলেন, সুন্দরী নারীর উপর আমার যে তাক্ আছে, তা বোধ হয় এ টের পেয়েছে। তাই ভয়ে তার কথা ফাঁস করছেনা। নিশ্চয়ই রূপীর মা পরমা সুন্দরী, অহল্যার চেয়েও। বললেন, চুপ করে রইলে যে, যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির ভগ্নস্বরে বললো, সে গিয়েই তো আমার ঘরের লক্ষ্মী গিয়েছে, বাবু।

কোথায় গিয়েছে ?

তা জানিনে। জানতেও চাইনে।

কেন ?

তাকে তো আর ঘরে নিতে পারবোনা, বাবু।······

যুধিষ্ঠির ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

বৃহস্পতি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদোনা, কি হয়েছে, বলো।

বাবু, সে ছিল আশ্চর্য সুন্দরী ······এই অপরাধে আমার ঘরে তার ঠাঁই হ'লনা! জমিদার বাবুর নজর পড়লো······আমাকে লোভ দেখালো, তোর সব খাজনা মাপ করব, যুধিষ্ঠির···একশো টাকা দেব···আমি টাকা তাঁর পায়ে রেখে বললুম, বাবু, রূপীর মা আপনার মেয়ে।······ শুনলেন না······একদিন সাঁঝ-রাতে তাঁর পাইকরা আমার অনুপস্থিতিতে তাকে ধরে নিয়ে গেলো।···সেই থেকে তাকে হারিয়েছি।······

কেন, তুমি তাকে উদ্ধার করলেনা, কেন?

চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু জানেন তো জমিদার·····তাঁর সঙ্গে লড়ে কার সাধ্য! রূপীর মা যখন ছাড়া পেলো তখন······আমি ঘরে নিতুম······কিন্তু ওরা বাধা দিলেন, বললেন মুসলমানের ছোঁয়া। আমি বলি, না···জমিদার বাবু······কিন্তু কথা শেষ করতে পারলুম না······লাঠির ঘা এসে মাথায় পড়লো······অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।··· একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, জ্ঞান হয়ে দেখি,

আমি হাসপাতালে। রূপী রূপী করে মন কাঁদে দিনরাত ...ভালো না হয়েই গাঁয়ে ফিরে এলুম...এসে দেখি...... রূপী নেই—মুসলমানরা তাকে বলের মতো লোফালুফি করে শহরে নিয়ে নিয়েছে...অছেরমোল্লা বললো, সে খাতায় নাম লিখিয়েছে শহরে গিয়ে।

যুধিষ্ঠির অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

ইন্দ্রের জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা ছিল কোন্ শহরে, কত নম্বর বাড়িতে থাকে সে, নাম বা কি,...কিন্তু বৃহস্পতির ভয়ে সাহস হলনা।

বৃহস্পতি বললেন, এই কি মর্ত্যের ছবি নাকি!

নারদ জবাব দিলেন, না দেবগুরু। মর্ত্যটা, আমি বেশ করে ঘুরে দেখেছি। এটা একটা আজব জায়গা। প্রাকৃতিক শোভার কথা যদি ধরেন তো একে সার্টি-ফিকেট আপনাকে দিতেই হবে, কিন্তু মানুষের কথা যদি ধরেন তবে...তবে...আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে, দেবগুরু... মোদ্দা কথা হচ্ছে, জলরুটি ইত্যাদি মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো বস্তুরই অভাব নেই এখানে, স্থানেরও অকুলান নেই,...শুধু ন্যায্য বাটোয়ারার অভাব। লক্ষ লোকের মুখের গ্রাস, বাসের জমি কেড়ে নিয়ে এখানে মুষ্টিমেয় বড়লোক হয়, জমিদার হয়, রাজা হয়। আর এমনি

চমৎকার এদের আইন-কানুন, যে, ধনী ক্রমশ ধনীই হয়, আর গরিব আরো দারিদ্র্যে ডুবতে থাকে। টাকা যদি থাকে আপনার তো আপনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকুন বা বেশ্যা নাচিয়ে ফুর্তি করুন, খাট্‌তে হবে না, টাকায়ই আশ্চর্য কৌশলে টাকা আনবে। যাকে বলে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীঁচি।

ইন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন, নারদ ঠাকুর স্বয়ংই দেখি এবার কমিউনিজম্ না কি বলে তাই শুরু করে দি'লন।

নারদ বললেন,···ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন। হালে এখানে অর্ডিনান্স চলছে। পালাই চলুন।

কেন?

টিক্‌টিকি এর প্রত্যেকটি কথা এতক্ষণ রিপোর্ট করে দিয়েছে কর্তাদের কানে। শহরে পালাই চলুন।

বৃহস্পতি বললেন, শহরে গিয়ে কি দেখব?

দেখবেন, স্বর্গাদপি—অর্থাৎ কিনা মর্ত্যের ঐশ্বর্য—আকাশ-স্পর্শী হর্ম্যমালা, বিজলী বাতি, রেডিও, পিচের রাস্তা, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ি, থিয়েটার, বায়োস্কোপ—আরো কত-কি?

বৃহস্পতি প্রশ্ন করলেন, মর্ত্যের অধিকাংশ স্থানই কি এইরকম?

রাম বলো। সাগরের বিন্দুর মতো শহর পৃথিবীর

একটা বিন্দুমাত্র অধিকার করে আছে। তাও শহরের সবাই আবার সুখের অধিকারী নয়…অধিকারী মুষ্টিমেয় …সুখ যোগাবার জন্য লক্ষলক্ষ লোক সে সভ্যতার কারখানায় বন্দীমাত্র।

বৃহস্পতি বললেন, তবে শহর দেখে আমার কাজ নেই।

নারদ হেসে বললেন, এইটুকুনেই ভয় পেয়ে গেলেন, তবু তো খনি, কারখানা, কলের কথা বলিনি।

বৃহস্পতি বললেন, বলেও কাজ নেই। চলো দেব-লোকে।

যুধিষ্ঠির বললো, সে কি চলে যাচ্ছেন ?

হাঁ।

কোথায় যাবেন ? পথের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না ?

হাঁ, কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। তোমায় শুধু একটা কথা প্রশ্ন করতে চাই।

করুন।

আচ্ছা যুধিষ্ঠির, তুমিও তথাকথিত অভিজাতদের মতো রক্তমাংসধারী মানুষ। তবে কেন অহরহ এই অপমানকর অত্যাচার নীরবে সইছ ?

যুধিষ্ঠির বললো, কি করব বাবু? এযে আমার কর্মফল।

কর্মফল?

হাঁ। পূর্বজন্মে, পাপ না করলে কেউ ধোপা হয়? পাপ করেছিলুম, তাই এ জন্মে নরকভোগ করতে হচ্ছে।

তুমি নরকভোগ কচ্ছ? পৃথিবী তোমার কাছে নরক?

ইন্দ্র উল্লাসের হাসি হেসে বললেন, সে কিগো যুধিষ্ঠির, তোমাদের বাল্মীকি মুনি না বলেন, স্বর্গাদপি···

যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের কথার মানে না বুঝতে পেরে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলো।

দেবতাত্রয় সেইখান থেকেই স্বর্গে ফিরলেন।

তদন্তের রিপোর্টে বড় বড় হরফে লেখা হল, জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী···এটা ডাহা মিথ্যা কথা। ভারতবাসীর এ জন্মভূমির স্তোত্র নিতান্তই মৌখিক······আসলে তারা ভারতকে নরকে পরিণত করে রেখেছে।

দু'জন

খুনী আসামী

আমাদের গাঁয়ের সেখ কালু তার বউ জহরৎবিবির গলায় একদিন ছুরি বসিয়ে দিলে।

আদালতে আমরা তার বিচার দেখতে গেলুম।

স্বদেশী খুনী আসামীদের কাহিনী শুনে শুনে মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলুম কালুকেও দেখব গিয়ে দণ্ডবিষয়ে উদাসী, নির্ভীক, নির্বিকার, হাস্যমুখ বারীন ঘোষ সম যোগী পুরুষ। কিন্তু দেখে ভুল ভাঙলো, কালু কাঁদছে, তার কণ্ঠে শব্দ তেমন নেই। চোখেও অশ্রুবিন্দু, কিন্তু তবু তাকে দেখলে মনে হয় কাঁদছে।

খুনী আসামী কাঁদে এ এইতো নতুন দেখলুম। দরদ-ভরা বুকে কালুকে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, কি হয়েছিল, কালু ?

কালু জবাব দিতে পারলোনা। তার দৃষ্টি আরো

করুণ, আরো ক্রন্দনোন্মুখ হ'য়ে এলো। জবাব দিল কালুর এক দোস্ত। আমাকে আদালতের বাইরে নিয়ে বললো, বাবু, ও পাগল হ'য়ে যাবে।

আমি অবাক হয়ে বললুম, ও তাহলে পাগল হয়ে বউকে খুন করেছিলো ?

ম্লানহাস্যে দোস্ত জবাব দিল, না বাবু। বিবি বাপের বাড়ি চ'লে যাবে ভয় দেখিয়েছিল বলে রাগের মাথায় তার গলায় ছুরি বসিয়েছে।

আমি বললুম, কি আশ্চর্য ! এই সামান্য কারণে···

তার পরেই মনে হল, অপরাধ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের কথা······দুনিয়ার শতকরা নিরানব্বই জন খুনী খুন করে হঠাৎ যৎসামান্য একটু কারণে তেতে উঠে'।

দোস্ত বললো, তখন পাগল হয়নি, কিন্তু এখন হবে। দেখেছেন তো ভাব !

হাঁ।

কালুকে প্রবোধ দিয়ে চলে এলুম।

তার দিন কয়েক পরে কালুর ফাঁসি হয়ে গেলো।

* * *

মনটা বিষণ্ণ, কোন কাজে ভিড়তে চায়না। কালুর অদৃষ্টের কথাই ভাবছি !

হঠাৎ আমার মামাতো ভাই তারক একখানা চিঠি নিয়ে এলো।

খুলে দেখি, মেয়েলি হরফে লেখা চিঠি। স্থানে স্থানে ধ্যাবরানো। প্রথমটা ভাবলুম, অসাবধানতায় জল এসে পড়েছিল লেখার ওপর। কিন্তু প'ড়ে বুঝলুম জল নয়, অশ্রুবিন্দু······লেখিকা যা কোন মতেই রোধ করতে পারেনি।

চিঠিটা এই—

মহীন দা,

লিখতে পাচ্ছিনে, হাত কাঁপছে—চোখে ঝাঁপসা দেখছি। তুমি এসো······যদি শেষ দেখা দেখতে চাও।···

হতভাগিনী আভা

আভা আমার মাসতুতো বোন। বেশ ভালো ঘরে গুণবান বরে বিয়ে হয়েছে। সে অনেকদিনের কথা। একবার তার শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলুম, আভার মুখ সেইদিন সুখ-সৌন্দর্যের জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল। তারপর অনেকদিন যাইনি। যাবো যাবো করেছি। কিন্তু আজ হঠাৎ এ মর্মস্পর্শী আহ্বান এসে পড়ায় যাবার আনন্দ আর রইল না। মনে জাগলো একটা অসীম ঔৎসুক্য। গিয়ে দেখা দরকার, আভা কেন ডেকে পাঠিয়েছে, হঠাৎ তার কি হ'ল!

তারক তার জবাব দিলো। হঠাৎ নয় মহীন্‌দা। তুমি এখানে ছিলেনা এতোদিন, জানোনা। শোনো। আভা একবার মাসিমার কাছে যাবার জন্য বায়না ধরে, বিজনবাবুও কিছুতেই ছাড়বেন না, কিন্তু আভা এলো মাসিমার কাছে। তারপর……

তারকের স্বর যেন আর্দ্র হ'য়ে এলো। আমি চম্‌কে উঠলুম, কালু সেখের কাহিনী মনে এলো—ঠিক্ অনুরূপ ঘটনা। বাপের বাড়ি যাবার বায়না, কিন্তু পরের পরিচ্ছেদও কি তাই? তারকের মুখের দিকে চাইলুম উৎসুক হ'য়ে।

তারক বললো, সেই থেকে আভার দুর্ভাগ্য শুরু।

আমি বললুম, কেন, বিজনবাবু কি আভাকে নির্যাতন ক'রতো ?

তারক দুঃখের হাসি হেসে বললো, না, মহীনদা। বিজনবাবু শিক্ষিত লোক, স্ত্রীর গায়ে কি তিনি হাত তুলতে পারেন। নির্যাতনের বড় অস্ত্র তার তূণে ছিল, তাই তিনি একে একে প্রয়োগ করেছেন।……

আমি অবাক্ হ'য়ে তারকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম, তারক বলে কি!

তেমনি হাসি হেসে তারক বললো, চলো তুমি

মহীনদা, নিজের চোখে দেখবে : বিজনবাবুর সে বাণ ব্যর্থ হয়নি।

আর বাক্যালাপ না করে আভাকে দেখতে গেলুম।

*　　　*　　　*　　　*

গিয়ে আভার দেখা পেলুম না। হতভাগিনী আগেই চ'লে গেছে......আমার জন্য রেখে গেছে একখানা ডায়েরী। আভার এক বন্ধু চুপি চুপি আমার হাতে তা এনে দিলে, বললে, আভার শেষ অনুরোধ ছিল, 'মহীনদা এলে তাকে দিও।'

হাতে নিলুম, কিন্তু পড়তে পারলুন না। বারে বারে চোখের জল দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে দাঁড়ায়।

বাড়ি এসে মন যখন শান্ত হল তখন ডায়েরী খুললুম। তারক ঠিক বলেছে, বিজনের তূণে বাণের অন্ত ছিল না। আভা লিখেছে একস্থানে,......ওরা আমায় খুন করতে চায়, কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না...তাই...হাঁ...তাই এই অস্ত্রাঘাতের চেয়ে ভীষণ ব্যবস্থা।......

নারী নির্যাতনের সে বিস্তৃত তালিকা দিয়ে লাভ নেই, আমি ভাবছি শুধু, তার শোচনীয় পরিণাম,... মৃত্যু।

তারককে সে কথা বলতেই সে ক্ষেপে উঠলো, মৃত্যু,

...মহীনদা, তুমি একে মৃত্যু বলছ? এ খুন্...আইন বাঁচিয়ে খুন, মৃত্যু নয়।

তারককে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আমার নিজের মনই যে প্রবোধ মানেনা, বলে, হাঁ, খুনইতো... তবে তফাৎ, কালু তার বউর গলায় ছুরি বসিয়ে একমিনিটে খুন করেছে, আর বিজন খুন করেছে তার বউকে দীর্ঘজীবন ধ'রে তিলে তিলে পলে পলে।

দু'জনেই খুনী আসামী।

রক্ষক

পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ কিন্তু সোজা—কাঁটা, কাঁকর থাকলেও এমন মারাত্মক কিছু নয়। দু'পাশে ঘন বন—বাঘ ভাল্লুক আছে—কিন্তু তার জন্য ভয় কিছু নেই। বেশ ফুর্তির সঙ্গেই পথ চলেছি আমরা।

হঠাৎ হাত তিরিশেক দূরে একটা লোক একটা বন্দুক নিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল—তার পিছন পিছন আরো অনেক বন্দুকধারী এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। ওরা কি চায়? ডাকাত বুঝি!

পিছনে তাকালুম—চাকরদের মাথায় আমাদের বন্দুকের টোটা ছিল—পিছনের বন থেকে আর একদল লোক বেরিয়ে তা কেড়ে নিচ্ছে। আমরা ছুটে গেলুম কিন্তু তার আগে কাজ ফতে হ'য়ে গেছে—সবগুলি বন্দুকের টোটা ডাকাতদের হাতে। আমরা বন্দী।

সোজা এগিয়ে গিয়ে সর্দারকে বললুম, তোমরা আমাদের ওপর কেন এ জুলুম ক'রছ? এর মানে কি? একটু মিষ্টি রকম হেসে সর্দার বললে, এর মানে হচ্ছে, আমরা তোমাদের বিপদে দেখে তোমাদের রক্ষা করার ভার নিতে এসেছি।

আমি বললুম, কই আমাদের তো কোনো বিপদ নেই। সর্দার ব'ললে, আছে বইকি। জানো এই বনের ফাঁকে ফাঁকে হিংস্র বাঘ সিংহীর আড্ডা···ওত পেতে আছে তারা··· সুযোগ পেয়েছে কি তোমাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

আমি বললুম, তা কেন। আমরা তো বন্দুক ধরতে জানি। সর্দার বললে, কিন্তু তোমাদের গুলি নেই।

গুলি তো তোমরাই কেড়ে নিলে।

যেই নিক্—সোজা কথা হচ্ছে তোমাদের গুলি নেই ···অতএব নিজেদের রক্ষা করতে তোমরা অশক্ত।

বাঃ রে—তোমরা গুলি কেড়ে নিলে, আবার তোমরাই আমাদের অশক্ত বলছ? গুলি ফিরিয়ে দিয়ে দ্যাখো···

···খবর্দার! ওসব কথা ব'ল না। গুলি দিয়ে কি হবে—আমরাই তো তোমাদের রক্ষার ভার নিয়েছি।

আমি প্রতিবাদ করে' বলতে গেলুম, বাঘ ভালুককে ত আমরাই···

সর্দার বললে বাধা দিয়ে—আঃ, ওহে শুধু বাঘ-ভালুক নয়, তার চাইতেও ভয়ংকর জানোয়ারের ভয় আছে এপথে —ডাকাত! ডাকাত! বুঝলে?

কিছুই বুঝলুম না! এরা কি তবে ডাকাত নয়?

সর্দার বললে—হ্যাঁ, সাধে কি আর ভার নিয়েছি। এই নাও তোমাদের কপালে আমাদের চিহ্ন এঁকে দিচ্ছি—নির্ভয়ে বন পার হয়ে যাও। ডাকাতের ভয় থাকবে না।

অবাক্ হলুম—ডাকাতের ভয় করব? কেন, আমরা কি মানুষ নই? কিন্তু সঙীন অবস্থা তখন—ঠ্যালায় পড়ে রাজি হ'তে হ'ল।

পথ চলতে লাগলুম আমরা।

ভারি ক্ষুধা বোধ হ'ল কিছুক্ষণ পরে—চেয়ে দেখি খাবারের জায়গা প্রায় খালি; আমাদের রক্ষকদের ভোগে তার পনেরো আনি গেছে, বাকি এক আনি আমরা এতগুলি লোকে খাবো।

চমৎকার রক্ষক!

এক্ষেত্রে ফল যা হবার তাই হল।

একমুঠো খেতে না পেয়ে আমাদের দলের একটি দুটি করে লোক মারা যেতে লাগলো।

তবু পথ বেয়ে চলছি—চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই বলেই চলছি!

চলছি—আর মরছি। ক্ষুধায় মরছি, বাঘের মুখে পড়ে' মরছি, রক্ষকের গুলি খেয়ে মরছি, ক্ষুধাজনিত রোগে ভুগে

মরছি।—তবু চলেছি।

পথ শেষ হয়ে এলো বুঝি!

কৈ? নাঃ! আবার তো সেই জায়গায়ই এসে পড়লুম, যেখানে আমাদের রক্ষকদের সঙ্গে প্রথম দেখা। বললুম, কই হে সর্দার, ডাকাত তো দেখলুম না পথে!

সর্দার একটু মুচকি হাসলো—উত্তর দিলে না। বুঝলুম ডাকাত কারা! আমরা বন ভেঙে বেরিয়ে যেতে চাইলুম—সর্দার বাধা দিয়ে বললে, হুকুম নেই ওদিকে যাবার—এই পথে হাঁটো।

এতো গোলক ধাঁধাঁ, চলছি কিন্তু কোথাও যাচ্ছিনো।

আমরা বেরোবার পথ করে দেব। তোমরা লক্ষী-ছেলের মতো হাঁটো।

আমরা এখনও হাঁটছি লক্ষী ছেলের মতো—একবার নয়, অনবরত। ঘাড়ে আমাদের বন্দুক......বাইরের লোক ভাবে, ওদের ঘাড়ে তো বন্দুক আছে—রক্ষকরা ওদের ওপর তো কোন অবিচার করছে না।

হায়রে! কেউ তো জানে না, এ বন্দুকে গুলি নেই।

———

মানবের নাহি দেয় দোষ
নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি

বন্ধু,

ভালোই বলো, মন্দই বলো, পাড়া বেড়ানো আমার বাই।

এ দুনিয়ায় হালই এই। কেউ চলে বিদ্যুদ্দীপালোকিত বিপণি-সুন্দর রাজপথে, সো-কেসে সাজানো দামী পোশাক শাড়ি র‍্যাপারের দিকে তার প্রশংসমান লুব্ধ দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায়। কেউ চলে অলি-গলি অন্ধকার রাস্তায়। তুমি বলবে জানি কী এমন আছে সেখানে?

বন্ধু, নেই, সত্যিই কিছু নেই। অন্ধকার পথে চলি, শূন্য-সম্পদ ঘরগুলির অল্পান্ধকার বাতায়নগুলির সামনে দিয়ে নির্বাক চলচ্চিত্রের মতো চলে যাই, কানে ভেসে আসে সর্বহারাদের দুঃখময় জীবনের আভাস—বড় পুঁথির ছোটো সূচীপত্রের মতো। আর মন জ্বলতে থাকে। তুলনা করি মনে মনে—ঐ রাজপথের অধিবাসীরা কতটুকুর যোগ্য, কতটুকু পেয়েছে—এরাই-বা কতটুকুর যোগ্য, কতটুকু পেয়েছে। কিছু পায়নি, বন্ধু, কিছু পায়নি। তার জন্য তত

দুঃখ করি নে। আজ যে পায়নি, কাল সে পেতে পারে। মানুষের ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে আজো জন্মায়নি। দুঃখ, ওরা দাবি করার শক্তি হারিয়েছে। দুঃখকে ওরা ভাবে স্বাভাবিক, মানুষের হাতেই যে মানুষের ভাগ্য ঘুরছে ফিরছে, একথা ওরা বোঝেনা। ওরা কি বলে জানো?

অদৃষ্ট—

এই সর্বনাশী অদৃষ্টের নেশা হ'তে কে ওদের মুক্তি দেবে?

* * * *

একদিন পথ চলেছি—গাঁয়ের পথ—সেদিনও অন্ধকারে ভরা পথ। অদূরে ক্ষীণ আলো-রেখা। আলো লক্ষ্য করে এগোতে লাগলুম—যাত্রা শেষ হল এক দালানে এসে। তাকে দালান না ব'লে দালানের ভগ্নাবশেষ বলা উচিত।

গৃহস্বামিনী এক তরুণী—ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন বসন তার গায়ে যেন চাঁদে কলঙ্কের মতো লগ্ন হয়ে আছে। আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু বসাবেন কোথায় ভেবে যেন সংকুচিত। আমি একটা মাদুর টেনে বসে পড়ে ফুলের মতো একটি খুকীকে কোলে টেনে নিলুম। আরো তিনচারটি ছেলেমেয়ে উৎসুকনেত্রে আমাকে এসে

ঘিরে দাঁড়ালো।

মা রান্নার জোগাড়ে চলে গেলেন।

আমার মজলিস চলতে লাগলো। ছেলেমেয়ের দল আমাকে মিনিট দশেকের মধ্যে পরমাত্মীয় করে তুললো।

জুড়ন বলে একটি দশবছরের ছেলে—তার সঙ্গে ভাব হল সব চেয়ে বেশি। বললো, আমার দিদিকে দেখেছেন, সে 'ফিরে চলো' গানটা ভারি চমৎকার গাইতে পারে।

কে তোমার দিদি ?

জানোনা ? পুষ্প······ব'লে জুড়ন এদিক-ওদিক ব্যস্ত হয়ে চাইতে লাগলো, যেন পুষ্প এসে পড়লে সে বাঁচে। দিদির বর্ণনা রূপ শক্ত কাজটা সোজা হয়ে যায়, তারপর যেন দিদিকে কোথাও না দেখতে পেয়ে হঠাৎ বলে ফেললো, জানো দিদির বিয়ে!

চপলা ব'লে মেয়েটি বললো, মাগো, কী বড়, চুণ-মাখানো মাথা······

জুড়ন হেসে বললো, পাকা চুল কিনা, তাই চপল বলে চুণ-মাখানো মাথা। বলে, অমন বর বিয়ে করার চাইতে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। ভয় নেই, মা বলেছেন,

তোর বর আনবেন কার্তিকের মতো।

কৌতূহল হল। এ বাড়িতে কাল বিয়ে—এ না বললে তো বিশ্বাস হয়ই না, বললেও হওয়া শক্ত।

হঠাৎ দেয়ালের দিকে নজর পড়লো…একখানা ছবি টাঙানো…গ্রুপ ফটো…

জুড়ন চিনিয়ে দিলো।

একঘণ্টার আলাপে মোটামুটি যা তথ্য সংগ্রহ করলুম তা হচ্ছে এই—বাড়ির মালিক সুধাংশুবাবু যখন মারা যান তখন তার কাছে ছিল একমাত্র বড় ছেলে রামলোচন। মৃত্যুর পর তিন মেয়ে এবং দু'ছেলে পথে বসলো—কারো জন্য পিতা কিছু রেখে যাননি।…সেজ এবং ছোট ছেলে তখনো পড়ছিল, তাদের পড়া বন্ধ হল। বড় মেয়ের বিয়ে হল এক গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে, দিন কয়েক মধ্যে সে বিধবা হয়। মেজ মেয়ে আত্মহত্যা করে অবিবাহের গ্লানি হতে আত্মরক্ষা করে। ছোটো মেয়ের বিয়ে হয় এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে—অত্যন্ত দারিদ্র্যে তাদের দিন কাটে। মেজ ছেলে এই পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় মাতুলালয়ে থাকে…তারই ছেলেমেয়ে এই পদ্ম, চপলা, জুড়ন, নুটু, ছোট ভবঘুরে হয়ে ফেরে। অবস্থা ভালো বড়োর।

শুনলুম, শ্বশুরের দেওয়া অনেক টাকার জোরে তার

এই সৌভাগ্য।

*　　　*　　　*

তারপর অনেকদিন চলে গেছে,—একদিন ভবানীপুরে এক বাড়ি গেছি, তেতালা বাড়ি, মোটর, চাকর, বাঁদী, আয়া —কোনো কিছুরই অভাব নেই।

সঙ্গে ছিল আমার রাজেনবাবু—তার উকিল এবং আমার আত্মীয়।

ফেরার পথে রাজেনবাবু ভদ্রলোকের কেচ্ছা বলতে লাগলেন, বললেন, লোকটা কম ধড়িবাজ! বাপ অগাধ বিষয় রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু মরার পর ভাই বোন কাছে ছিলনা, এই সুযোগে সব গাপ করে গেলো।

আপনি জানতেন ?

হাঁ,······

এর প্রশ্রয় দিলেন ?

রাজেনবাবু একটু হাসলেন। হাসির অর্থ কি, তা আমি বুঝলুম, কাজেই ও প্রশ্ন আর করলুম না। শুধু জিজ্ঞেস করলুম, ভদ্রলোকের দেশ কোথায় ?

চাঁপালে।

চাঁপাল——চাঁপাল——

সেইদিনের সেই কথা মনে হ'ল——এই জুড়নের

জ্যাঠা।......

বঞ্চিত-সম্পদ পুত্রকন্যাদের কাছে গেলুম আবার... সকলকে প্রশ্ন করলুম একে একে, আপনাদের এ কষ্টের জন্য কে দায়ি ?

মেজ ছেলে বললে, কপাল। পূর্বজন্মে কত পাপ করেছিলুম, তার ফল—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোটো ছেলে বললো, ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্য। 'দুঃখ দিয়ে রাখেন তব মান' রবি ঠাকুর বলেছেন জানেন তো—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বড় মেয়ে প্রথম খানিকটা কাঁদলেন, তারপর বললেন, এজন্মে সুখ হলনা, ওপারের দিকে চেয়ে আছি আমি।

ছোটো মেয়ে কি জবাব দেবে খুঁজে পেলোনা, শেষটা বললো, সন্তোষের চেয়ে সুখ নেই। কত লোক তো আমাদের চেয়েও কষ্টে আছে।

চমৎকার ! অদৃষ্ট, কর্মফল, পুনর্জন্ম, পরকাল, ভগবান্ মঙ্গলময়, সন্তোষ——বাঁধি-গৎ সবার মুখে, ঠকিয়েছে যে তাদেরই একজন, তার খবরও রাখেনা, সন্দেহও করেনা। মানবের নাহি দেয় দোষ !

এইতো আমাদের সমাজ বন্ধু ! তুমি কৌশলে অত্যাচার

করো, অত্যাচারিত বলবে, এ আমার কর্মফল। তোমায় স্পর্শ করে কার সাধ্য। চমৎকার!

*　　*　　*

আসল সত্য কি জানো বন্ধু, মানুষের পথ আজ রুদ্ধ। তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে তোমাদের ধর্ম, তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের দেবতা।

চলার সাধ্য কোথায় তোমার? যুক্তি তোমার চাপা পড়ে আছে অন্ধ আনুগত্যের জগদ্দল পাথরে।

মুষ্টিমেয় অভিজাত অপূর্ব কৌশলে তোমাদের ওপর অহরহ অত্যাচার করছে। আর তোমরা যাতে তার জন্য তাদের না দায়ী করতে যাও, তাই এই ধর্ম, দেবতাকে আকাশে তুলে তারা তোমাদের চোখ ঝলসে বিচার-বিভ্রম ঘটিয়েছে। অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী না হ'য়ে ওঠো, তাই তাদের এই অদৃষ্ট, কর্মফলের আমদানী। সন্দেহ যাতে না কর তাই তাদের "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" কথার প্রচার। অভিনব যুক্তি!

বন্ধু, স্বার্থ-সচেতন মুষ্টিমেয়ের অত্যাচারসমর্থনকারক তোমাদের এই ভগবানে আমি বিশ্বাস করিনা।

আমি নাস্তিক।

আমি জানি, অবিচার এবং ভগবান—দু'জনের ঠাঁই

হ'তে পারেনা দুনিয়ায়। ভগবানের অস্তিত্বের সঙ্গে এ দুনিয়ার কোনো কিছুই খাপ খায়না—তাই ভগবান নেই। জানি তোমরা লীলা ব'লে মনকে চোখ ঠার দেবে,—হাঁ, লীলা বটে, কিন্তু ভগবানের লীলা নয়—মুষ্টিমেয় শোষকের লীলা। মানুষের ভাগ্যচক্র চিরদিন তারাই ঘোরাচ্ছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দোহাই কথায় কথায় দিয়োনা, শোনা কথাকে সত্যের কাঁচিতে কাটার সাহস যদি থাকে তো দেখবে তিল শুধু তাল হয়নি, হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগ—যা একান্তই দৈহিক বা মানসিক শক্তি—তার নামকরণ হয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনা।···আর দেবদর্শন, সিদ্ধিলাভ······আমাদের রাঙা কাকাও মাসে দুবার করে দর্শন পেতো দেবতাদের—স্বপ্নে। তফাৎ সে ঘুমিয়ে স্বপন দেখেছে, তোমাদের মহাপুরুষরা দেখেন জাগ্রত স্বপন। ব্রাহ্মদের চোখ বোঁজা, খৃস্টানদের কনফেশন, হিন্দুদের কীর্তনোন্মাদ ভাব দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, বন্ধু।

এই ধর্ম হতে মুক্তি চাই···

বন্ধু, তার আগেতো মানুষ তার প্রাপ্য কি বুঝতে শিখবে না, প্রাপ্য যা তা দাবি করতে শিখবেনা,——চির-বঞ্চিত চির-লুণ্ঠিত হয়েই দিন কাটাবে।

*　　*　　*　　*

আজও একই ভাবে পথ বেয়ে চলেছি বন্ধু—অন্ধকা
আজও শুনছি অত্যাচারিতের আর্তনাদ——আজও
পাচ্ছি মানুষের ওপর মানুষের জুলুমের—যুক্তি
ধর্মদেবতার অন্ধ-করা আবরণী—লক্ষ লক্ষ নরনারী
অন্ধকারে, আজো নিরন্ন, আজো সর্বহারা, আজো
করতে জানেনা, আদায় করতে জানে না।

মানবের নাহি দেয় দোষ,
নাহি নিন্দে দে· তারে স্মরি।

—০:*:০—